বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রসঙ্গ নিউক্লিয়ার ভারত

নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি,

নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন

নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রতিযোগিতা

বিষয়ে রচনা, মতামত।

সমীক্ষা, সংবাদ

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1985

দাম দুই টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1985

পারমাণবিক অথবা মানবিক ভারত—সৌমেন গুহ ☐ উপমহাদেশে নিউক্লিয়ার অস্ত্র রোধের প্রস্তাব ☐ পরমাণু বোমার মানসিকতা—ভারতে—রবীন মজুমদার ☐ সমীক্ষা—শিল্প বিকাশ ও উন্নয়নের ফল ঃ সিঙ্গরৌলী—প্রদীপ দত্ত ☐ ডেনমার্কের নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলন ও সফলতা ☐ চলচ্চিত্র ঃ দি ডে আফটার ☐ নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনের শহীদ ঃ রেইনবো ওয়ারিয়র—রবীন চক্রবর্তী ☐ সংবাদ ☐

কার্টুন ঃ সুপর্ণ চৌধুরী

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় ☐ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার বারো টাকা ☐ প্রাতষ্ঠানিক চাঁদা—চল্লিশ টাকা ☐ বাংলাদেশের জন্য—ভারতীয় টাকায় কুড়ি টাকা ☐ এজেন্ট কমিশন ঃ দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ, কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ ☐ এজেন্সীর জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় সেন্ট্রাল এভিনিউ ও বৌবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে বৌবাজার পোস্ট অফিসের বিপরীতে 52/9C বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলকাতা—700012, ঠিকানায় দোতালায় ডি. এস. এন্টারপ্রাইজের ঘরে ☐ প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-9 (সুকিয়া স্ট্রীটে ঢুকে খোঁজ করুন) ☐ ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা—অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, EC 106 সল্টলেক, কলকাতা700064।

চিঠিপত্র

চিঠিপত্রের দপ্তরের মাধ্যমে সাধারণ পাঠককে সরকারী গবেষণা দপ্তরের অবস্থা যে কী পরিমাণে দেউলে তা জানাতে চাই। সরকারের (তথা জনগণের) বিশাল অর্থ ও সুযোগ ধ্বংস করে 'গবেষণাদপ্তর'টি বড়লোকের ঘরের বখে যাওয়া নিষ্কর্মা দুলালে পর্যবসিত হয়েছে, এরকমই একটি দুঃখজনক দৃষ্টান্ত দেব।

আমার এক অতি পরিচিত ভদ্রলোক কাজ করেন লক্ষ্ণৌ-এর কেন্দ্রীয় সরকারের রেলবিভাগের গবেষণা দপ্তরে। ঐ গবেষণাগারটি অতি আধুনিক টেকনোলজি দ্বারা সমৃদ্ধ। রেলবিভাগ ঐ গবেষণা দপ্তরটি খুলেছেন দেশ-বিদেশের উন্নতির খবর জানা এবং দেশে তার প্রয়োগের ব্যাপারটা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে। বেশ কিছু কর্মী এখানে নিযুক্ত। কিন্তু তাঁদের ঠিক কি অর্থে 'যুক্ত' বলা যায় বৃত্তান্ত শুনে তা বোঝা যায় নি। বরং এখানে তাঁরা চিন্তা ভাবনা মুক্ত। শুধু কাজ হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা দূরে থাক, বিভিন্ন দেশ-বিদেশ থেকে আসা পত্রিকাগুলোর বিভিন্ন প্রবন্ধের তলায় দাগ দেওয়া এবং যথাসময়ে নিজেদের পত্রিকায় সেগুলি জুড়ে দিয়ে বের করা। এই হাঁসজারুরা যখন implemented হয় (যদি হয়; আদৌ হয় (!)) তখনই বা কি সাংঘাতিক ফলাফল হতে পারে তা ভাবা দরকার। ভদ্রোলোক মন্তব্য করেছেন, 'যখন খুসি আস যাও বড় আরামের চাকরি। একমাত্র ঝঞ্ঝাট হল টাইপিস্টের, সে বেচারিকে তলায় দাগ দেয়া অংশগুলো বুঝেশুনে টাইপ করতে হয়।'

কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে যদি এই চলে, ভারতের আধুনিকীকরণ ও তার সঙ্গে মানসিকতার উন্নয়ন কি স্তব্ধ হয়ে যাবে না? হাঁড়ির একটা চাল দেখেই তো ভাতের অবস্থা বোঝা যায়।

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া

বি-ও-বি'র কথা

যদিও আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে, 'বাংলাদেশ' ঘটনার সময় আমরা শুনেছিলাম—পাক-ভারত সংঘর্ষের শেষ দিকে ভারত মহাসাগরের বুকে এদিক পানে ধেয়ে আসছে আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের বৃহত্তম রণপোত 'এনটারপ্রাইজ'—আমরা ততোখানি চিন্তিত হইনি, কারণ চিন্তিত হতে আমাদের এক যুগ দেরী হয়ে যায় সাধারণত।

গত 29 জুলাই 1985, আমেরিকার 'টাইম' পত্রিকায় খোলাখুলিভাবে তখনকার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসন এক সাক্ষাৎকারে বলেছে—চোদ্দ বছর আগের সেদিন আমেরিকা প্রস্তুত ছিলো, এই ভূখণ্ডের ওপর নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করতে! জানি না, আরো চোদ্দ বছর লাগবে কিনা এ কথাটা বুঝতে, চিন্তা করতে।

সত্যিই কি আমরা নির্লিপ্ত থাকার সময় পাচ্ছি? ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা-উপদেষ্টারা নিউক্লিয়ার বোমা তৈরীর উপদেশ বর্ষণ করে চলেছে—কারণ পাকিস্তান এগিয়ে চলেছে সে পথেই, তাই প্রতিযোগিতা। নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনা কি এ ভূখণ্ডে খুব দূরে?

11 অগাস্ট 1985, ভারতের 'দ্য উইক্' পত্রিকায় নিউক্লিয়ার বোমার অন্যতম সমর্থক কে. সুব্রাহ্মণ্যম খোলাখুলিভাবেই জানিয়েছে—সামরিক কর্মসূচীর জন্যে শান্তিপূর্ণ নিউক্লিয়ার কর্মসূচী থেকে সুবিধে বার করে নেওয়ার অবস্থায় আমরা এখন এসেছি!

এখন সব খোলাখুলি—কোথাও আর সামান্য দ্বিধা কাজ করছে না। এটা গড়তে সময় লেগেছে—মুখ বুঁজে সেই 1956 সালের সময় থেকে, বিদেশের সাথে নিউক্লিয়ার কর্মসূচী সংক্রান্ত চুক্তি করার প্রথম লগ্ন থেকে, ঊনত্রিশটা বছর লেগেছে—এখানে পৌঁছতে। ভারতে নিউক্লিয়ার কর্মসূচী সম্বন্ধে আমাদের অতি-নীরবতার মূল্য দিতে হচ্ছে—কিছু রাজনীতিক মহলের হাতে নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান-প্রযুক্তি তুলে দিচ্ছে ভারতের কোটি কোটি মানুষের জীবনের ভবিষ্যতকে। এটা বুঝতে এখনো কতো বছর লাগবে?

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' এর আগেও নিউক্লিয়ার সম্পর্কে নানা বিতর্ক প্রকাশ করেছে। এ সংখ্যাতেও তা থাকছে। কিন্তু বছর যাচ্ছে—বিষয়টার গুরুত্বও বদলাচ্ছে। এখন ঠিক এটা ভারতে যতোখানি বৈঠকী বিষয়, তার চেয়ে এটা এখন দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে। আমরা আরো বিতর্ক চাইছি—মঞ্চ খোলা রইলো।

বিতর্কটা কিছুটা পুরোনো জায়গাতে থাকতেই পারে। কারণ, সমাধান অতো সহজে আসবে না—বিশেষত বিপুল সংখ্যক ভারতীয়ের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি না, তাদের এ বিতর্কে টেনে আনা প্রায় অসম্ভব। অথচ, এতো বড়ো একটা কর্মসূচীর ভালো-মন্দ বিষয়ে—অধিকাংশের বিতর্কে অংশগ্রহণের দরকার ছিলো।

ভারতের নিউক্লিয়ার কর্মসূচীর নানা কর্মকান্ড—আপনি কী ভাবছেন?

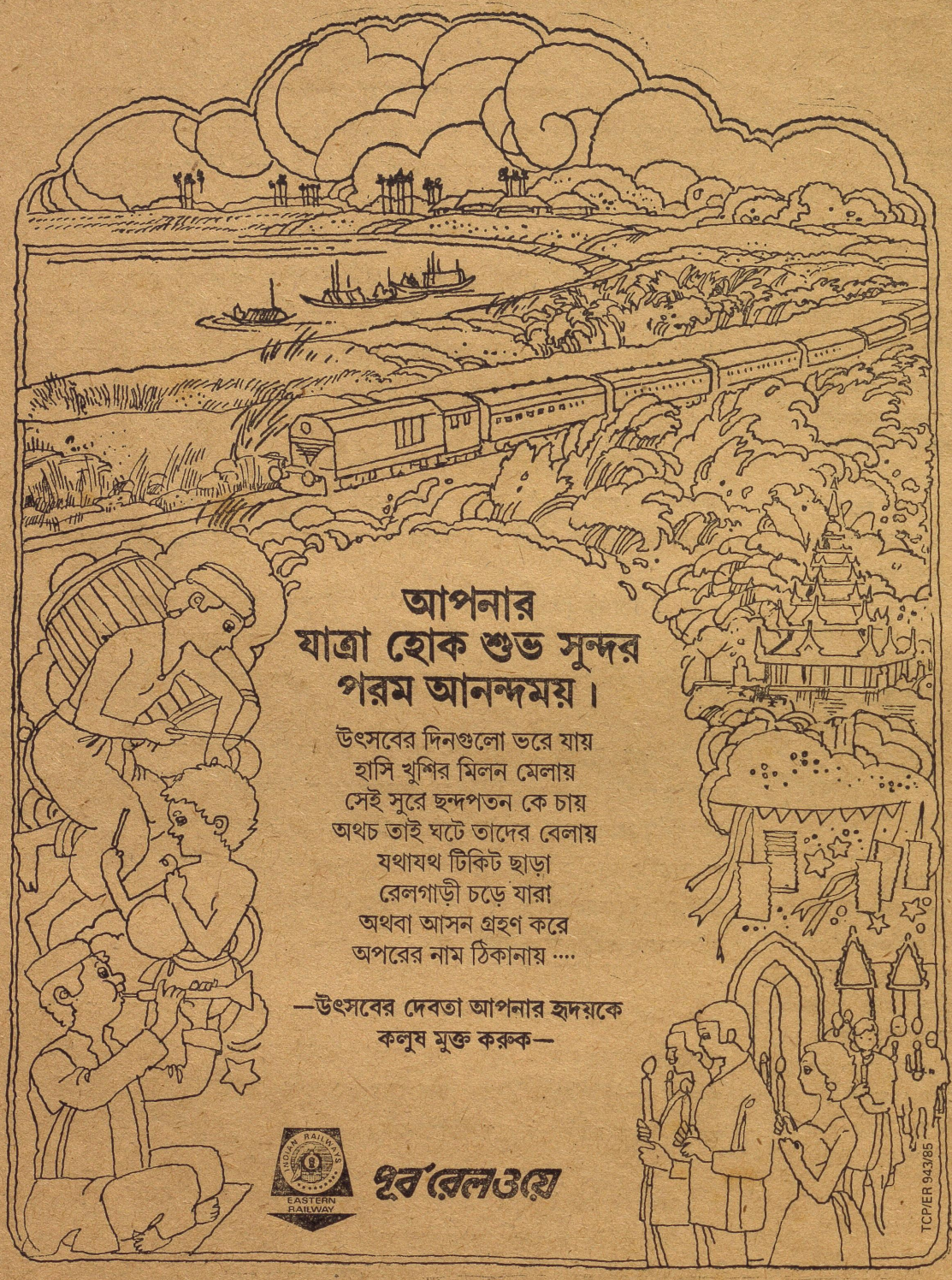

আপনার যাত্রা হোক শুভ সুন্দর পরম আনন্দময়।

উৎসবের দিনগুলো ভরে যায়
হাসি খুশির মিলন মেলায়
সেই সুরে ছন্দপতন কে চায়
অথচ তাই ঘটে তাদের বেলায়
যথাযথ টিকিট ছাড়া
রেলগাড়ী চড়ে যারা
অথবা আসন গ্রহণ করে
অপরের নাম ঠিকানায় ....

—উৎসবের দেবতা আপনার হৃদয়কে কলুষ মুক্ত করুক—

INDIAN RAILWAYS
EASTERN RAILWAY

পূর্ব রেলওয়ে

TCP/ER 943/85

পারমাণবিক অথবা মানবিক ভারত

—সৌমেন গুহ

প্রযুক্তিবিশারদরা এ দেশে 'শক্তি সমস্যা'র পুরো পরিপ্রেক্ষিতটাই উলটে দেখাচ্ছে। তার ফলেই নিউক্লিয়ার শক্তির উপর জোরটা পড়ছে। শক্তি সমস্যার আসল জায়গাগুলোকে চেপে দিয়ে নিউক্লিয়ার কর্মসূচীকে বাজারে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এই কর্মসূচীর ভিতরে কি হচ্ছে কজন খবর রাখি ?

বেশ চলছিলো কয়েক হাজার বছর ধরে। বিজ্ঞানীরা কী করছে তা নিয়ে সমাজের মাথাব্যথা ছিলো না—আর বিজ্ঞানীরাও দিব্যি অংক-বস্তু-যন্ত্র নিয়েই থাকতো। মোটামুটি লোক ভালো—অথচ সমাজ-টমাজ নিয়ে তেমন লেখালেখি করে নি, এমন বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিলো বেশী। হঠাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রান্তে এসে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে নিউক্লিয়ার বোমা ফাটিয়ে হলো নতুন বিপদ। এই বোমার সবচেয়ে বড় ফল্-আউট হলো—বিজ্ঞানের সমাজসচেতন হওয়ার টন টন (মেট্রিক, আক্ষরিক অর্থে) প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, বিতর্ক, বিশ্লেষণ। এমন অসহায় অবস্থায় মানুষকে আর পড়তে হয়নি।

মায় ভারতের মতো দেশটাতে লোককে এখন চাল-ডাল-তেল-নুন-গামছা-লুঙ্গি-পাঠসংকলনের সাথে খবর রাখতে হয়—শক্তি সমস্যা, খনিতে কয়লার পরিমাণ, দু'কাঁচ্চা ইউরেনিয়ামে নিহিত শক্তি, দানিকেন ঠিক না বেঠিক, জেনেটিক্ ইঞ্জিনীয়ারিং, পাকিস্তানের বিজ্ঞানী চুরির দায়ে ধরা পড়েছে কি না, কৃত্রিম উপগ্রহ আশীর্বাদ না অভিশাপ, ইত্যাদি। এই ফল্-আউটের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। সব থেকে বড় বিপদ, এই সমাজসচেতনতার লেখাগুলো বিজ্ঞানীদের কাজকর্মের বাই-প্রোডাক্ট্ হিসাবে বেরোচ্ছে—ফলে, আবর্জনা পরিমার্জনের ক্ষমতা না থাকলে, সবটাই গিলতে হচ্ছে।

আসলে সমাজটা বিজ্ঞান সচেতন হয়েছে—বিজ্ঞান সমাজ সচেতন হয়েছে—তবে অন্য কারণে।

সংজ্ঞা বদ্লাচ্ছে

টোডারো (Todaro) সাহেবের অর্থনীতির বইটা অনুন্নত দেশ সম্পর্কেই। নেহাৎ পাঠ্যপুস্তক, কিন্তু জমাট। এক দীর্ঘ আলোচনায় লেখক 'উন্নতি' (development) সম্পর্কে বিভিন্ন রক্ষণশীল মতামত সমালোচনা করেছে। বুঝিয়েছে GNP (Gross National Product) বা অর্থনীতির অন্যান্য পরিমাপক দিয়ে অনুন্নত দেশের উন্নতি বা বিকাশকে মাপা যায় না। টোডারো অবশেষে গুটিকয়েক পরিমাপক ঠিক করেছে—যার প্রথমেই আছে—খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য। লেখককে এই সাধারণ কথাটায় আসতে গিয়ে অনেক পাতা নষ্ট করতে হয়েছে—কারণ উন্নতি বা বিকাশের বনেদী ধারণাগুলো মানুষের বাঁচার নূন্যতম প্রয়োজনকে অস্বীকার করে। অস্বীকারের মাত্রা ভীষণ বলেই, এ সাধারণ কথা লিখতে টোডারো ও তার বিশাল-বপু বইটার সূত্র এখানেও টানতে হয়েছে।

ভারতের মতো দেশে—যাদের খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্যের সমস্যা নেই, তারা সংখ্যালঘু, মুষ্টিমেয় ভারতীয়। এই সংখ্যালঘু ভারতীয়দের স্বার্থে দাঁড়িয়ে সমস্ত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সিদ্ধান্ত যাবে বদ্লে—। কারণ প্রাথমিক সূত্রতেই বাদ পড়েছে সব চেয়ে বড় অংশ।

ইস্পাত শিল্প থেকে উড়োজাহাজ তাই-ই করেছে। এর মধ্যে যদি শক্তি, বিশেষত নিউক্লিয়ার শক্তির ফিরিওলাদের ধরি—দেখবো ব্যাভিচার কোথায় দাঁড়াতে পারে।

শক্তি বা energy বিষয়ে কয়েকটা ধাপে দেখবো, বিজ্ঞান কেন সমাজমুখী হচ্ছে। অর্থাৎ, সংখ্যালঘুর জন্যে সংখ্যাগুরুকে তার কেন বোঝাতে হয়—নানা চাতুর্যে।

শক্তির প্রথম স্তর খাদ্য

সাদামাটা ছেলেরা ঘাবড়ে যাবে—শক্তি বা energy-র প্রাথমিক সংজ্ঞায় লেখা আছে—'কাজ করার ক্ষমতা' (capacity for doing work)। ঘাবড়ে যাবে কারণ, এ দেশের দিকে তাকালে—স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন প্রাথমিক শক্তির উৎস।

যন্ত্রবিজ্ঞানের ইতিহাস মানুষের কাজকে সম্প্রসারণ করার ইতিহাস—যার মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানও পড়ে (Extension of Man, এই নামে যদি বলি—তা হলে কায়িক শ্রম হলো আদিমতম কাজ)। ভারতের মতো দেশে যেখানে কায়িক শ্রম হলো সব থেকে বড়ো যান্ত্রিক কাজ সেখানে শ্রমজীবী মানুষেরা শক্তির জোগান পাচ্ছে কিনা, সেটা হলো প্রাথমিক সমস্যা (একটু কথার মারপ্যাঁচে দাঁড়ায়—প্রতিটি ভারতীয় 3 হাজার ক্যালরি খাদ্যের জোগান পেলে, প্রতি দিন খাদ্য হিসেবে শক্তির জোগান দিতে হয় 70 কোটি ভারতীয়র জন্যে, মোট 2436 মেগাওয়াট-ঘন্টা)।

উন্নত দেশে, যে সব দেশ থেকে আমরা নিউক্লিয়ার, নিউক্লিয়ার-বিরোধী, শক্তি-প্রযুক্তির কথা শিখি—সে সব দেশে প্রধানত প্রাথমিক খাদ্য সমস্যা না থাকায় বিপত্তি। যেমন ডেনমার্ক। ডেনমার্কে প্রতিটি মানুষ সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় খাদ্য পায়—বেকাররাও। তার সাথে আশ্রয় ও স্বাস্থ্য। ওরা যখন বিকল্প শক্তির কথা বলে, বা

শক্তি সমস্যা নিয়ে কথা বলে—খুব স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যকে বাদ দেয়। মানুষটা খাদ্য পেলো না—অথচ গাড়ী চালাচ্ছে, উনুন জ্বালাচ্ছে, ঘরে আলো দিচ্ছে, এটা ভারতীয় শক্তি-বিশারদরাই ভাবতে পারে। যখন মানুষ খাদ্য পায় না, মানুষের গুরুত্ব কমে, খাদ্য তখনই শক্তির সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে। অর্থাৎ ভারতের সব চেয়ে বড় অংশ বাদ পড়ে, হয় পশ্চিমী দেশের সংজ্ঞা সফল করতে গিয়ে—অথবা পশ্চিমী সংজ্ঞার উপযুক্ত মানুষদের কথা ভাবতে গিয়ে।

অবশ্য খাদ্য নিয়ে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, না হওয়ারই কথা। কারণ বিজ্ঞানীরা, প্রযুক্তিবিদরা পর্যাপ্ত আহার করেই গবেষণা চালিয়ে যায়।

তাই ভারতে খাদ্য যে বেশীর ভাগটাই নবীকরণযোগ্য (renewable) শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়—এটাও ভুলতে বসেছি। নবীকরণযোগ্য—কারণ সব থেকে বেশীর ভাগ মানুষ চেষ্টা করে খাদ্য উৎপাদন করতে! এই নির্মম সত্যটা শক্তি সমস্যার আলোচনাকে গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট করলো? ভারতে প্রাথমিক শক্তির উৎস খাদ্য—এ কথা উল্লেখ করতে হবে, খাদ্য সমস্যা আছে বলেই। সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য। আশ্চর্যভাবে শক্তির উপকরণ থেকে এটা বাদ পড়লো।

জ্বালানী

ভারতে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের একটি গ্রন্থমালার নাম 'সেকেন্ড ইন্ডিয়া স্টাডিজ'। তারই একটি গ্রন্থ 'Energy', লেখক কিরীট পরীখ (Kirit Parikh)। এই একটি সমীক্ষাকে ধরে পশ্চিমী ধারণার (বলা উচিত, লোকঠকানো ধারণার) প্যাঁচগুলো ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে (সেকেন্ড ইন্ডিয়া মানে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আগামী শতকের গোড়াতে ভারতের সাথে দ্বিতীয় ভারত যুক্ত হবে। কাজেই ফোর্ড ফাউন্ডেশান আগেভাগে সমস্যা নিয়ে চিন্তিত!)।

এ রকম সমীক্ষায়, প্রথমেই থাকে, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই অধিক খাদ্য দরকার—তাই অধিক ফলনের দরকার—তাই জলসেচ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দরকার—আর এ সব করতে গেলে অধিকতর শক্তির দরকার (সমীক্ষক খাদ্যকে শক্তির উৎস বলেনি—পরিষ্কার করেই প্রথমে বলে নিয়েছে man needs machines, which need energy)। আর তার সাথে সমীক্ষায় যুক্ত হয়েছে রান্না ও আলোর জন্য জ্বালানী বা শক্তির সমস্যা। এ পর্যন্ত পড়তে বেশ লাগে। এমন কি তার পরেও—গ্রামবাসীদের জন্যে প্রধানত শক্তির জোগান ইত্যাদিও শুনতে ভালোই লাগে।

তারপর তথ্য (ধরে নিচ্ছি তা-ও ঠিক আছে)। যেমন (সংক্ষেপে)—ভারতে বিভিন্ন জ্বালানীর ব্যবহার (দশ লক্ষ টনের হিসেবে; কেবল বিদ্যুতের হিসেব বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘন্টায়):

	কয়লা	তেল	বিদ্যুৎ	গোবর	কাঠ	চাষের পরিত্যক্ত অংশ
1953-54	28·7	3.39	7·6	46·4	86·3	26·4
1970-71	51·35	15·31	48·65	67·28	122·76	37·77

এর পরের প্যাঁচটা একটু তৈরী থাকলেই ধরা যাবে। এটা শক্তি-বাবুদের পেটেন্ট। প্রায় সব গ্রন্থে লভ্য!

প্রথমে সমস্ত শক্তিকে একটি এককে নিয়ে আসবে—তারপর শক্তি ব্যবহারের বৃদ্ধির হার বেরোবে—এবার উল্টো হিসেব করে বিদ্যুৎ, কয়লা ও তেলের আলোচনায় ফিরে আসবে—অর্থাৎ বাণিজ্যিক (commercial) শক্তির হিসেবে ফিরে আসবে (সতর্ক থাকুন, ধরতে পারবেন)!

মাঝখান থেকে যাদুমন্ত্রের মতো অ-বাণিজ্যিক (non-commercial) শক্তিটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাই হয়—হতেই হয়। না হলে কতকগুলো অপ্রিয় ও অ-লাভজনক সত্য বেরিয়ে পড়বে। সেগুলো হলো—যা আমার নিজের অভিজ্ঞতাতে দেখেছি, সমীক্ষাতেও দেখেছি—

(1) অ-বাণিজ্যিক শক্তি (অর্থাৎ, গোবর, কাঠ, চাষের পরিত্যক্ত অংশ) পরিমাণের দিক দিয়ে—এমন কি শক্তির একই এককে পরিবর্তিত করলেও—সব থেকে বেশী। কাজেই ঐ সমস্যাটাই মাপে বড়ো।

(2) পরিমাণ নয়, গুণগত মানের দিক থেকে, অ-বাণিজ্যিক শক্তি সব থেকে বেশী অংশ মানুষের ব্যবহার্য। এ শক্তিকে বাতিল করা, মানে বৃহদাংশের সমস্যা না বোঝা। আর এ শক্তির ব্যবহারের পরিবর্তন অলীক কল্পনা—পরিবর্তন প্রায় হয় নি, হবেও না সহজে।

(3) অ-বাণিজ্যিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির হার অতি সামান্য—বিশেষত বাণিজ্যিক শক্তির তুলনায়। কাজেই শক্তি সমস্যার অতিরঞ্জিত আলোচনার আওতায় এটা পড়ে না। এর ব্যবহার বৃদ্ধির আলাদা চরিত্র আছে—অর্থাৎ সমাধান মানে চাষ, গবাদি পশু ও জঙ্গল বৃদ্ধি করা, যা দূষণ বিরোধী ও ফলত সুস্থ পরিবেশ দাবী করে।

(4) অ-বাণিজ্যিক শক্তি অ-বাণিজ্যিক। তাই—মানুষের একার বা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণে পুষ্ট বিকেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যবস্থা। আর্থনীতিক রাজনীতিক খবরদারী নেই। সত্যি বলতে কি—শক্তিবিশারদদের এ সবগুলোই পছন্দ হওয়ার কথা নয়। অথচ ভারতে ওদেরই সমীক্ষায় এটা বাস্তব। একটাই উপায়, ওটাকে উধাও করে দেওয়া। ব্যাপারটা হলো এই—সমস্ত হিসেবটা সংখ্যালঘু কয়েকজন মানুষকে নিয়ে, যারা বাণিজ্যিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে।

ভেতরের হিসেবটা উল্টো করে রাখা হয়েছে। বাণিজ্যিক শক্তির খরিদ্দার করে তুলতে হবে আরো বেশী লোককে, দেখাতেই হবে

বাণিজ্যিক শক্তিই দেশের মেরুদন্ড। এর থেকে মিথ্যাচার আর কী হতে পারে!

চলিত নিয়ম

বাকীটা সরল। তথ্যবিকৃতি করে দেখানো হলো ভারতের মানুষ খুবই তেল-কয়লা সংকটে পড়েছে (ভারতের বৃহৎ গ্রামাঞ্চলে যা একান্ত দুর্লভ)। সঙ্গে আছে বিদ্যুৎ সমস্যা। কার সমস্যা, কে জানে! তবু সমাধান এলো—আরো বিচিত্র—নিউক্লিয়ার শক্তি, বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি ইত্যাদি।

ছাতনার কাছে পলাশবন, কুশদ্বীপের শাল বন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গরাণ বন খাটো হতে থাকলো। চাষী গোবর জ্বালাতে গিয়ে—সার করতে পারলো না। চাষের পরিত্যক্ত প্রতিটি কণা কুড়িয়ে এনে জ্বালানী হলো।

তবু কসবায় গ্যাস টারবাইন, কোলাঘাটে তাপবিদ্যুৎ, রাজস্থানে নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটর ইত্যাদি। আর এ সবের পাই-পয়সা দিচ্ছে সেই বৃহৎ জনগণ—যারা শুধু বঞ্চিত তাই নয়—জাঁহাবাজ শক্তিবিশারদদের ছলচাতুরীভরা 'বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ' থেকে বাদ পড়েছে। বেশীর ভাগ এই শক্তিবিশারদদের ভারতীয় ফৌজদারী বিধির 420 ধারায় আদালতে অভিযুক্ত করা সম্ভব (Petition-এর খসড়া আমি করে দিতে পারি, গ্রন্থকয়েকের উদ্ধৃতি, সারণী, তথ্য ও সিদ্ধান্ত দিয়ে)। থাক্‌গে—বিদ্যুৎ ভাঙিয়ে তবু আধুনিকতা। করে থাক—কার আপত্তি। সমগ্র জ্বালানী সমস্যা নয়—বিদ্যুতের সমস্যাতেও সেই ছল।

কলকাতার তিন ভাগের এক ভাগ বস্তী (জানেন?), লোকসংখ্যার হিসেবে—যা কি না দার্জিলিং জেলার থেকে বড়ো! নেহাত নিরেট মাথা না হলে—বিশ্বাস করবে না কেউ এদের ভীষণ বিদ্যুৎ সমস্যা আছে। কারণ, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! প্রায় সমস্ত বস্তীই অন্ধকার। কলকাতার সমস্যা শতকরা 67 বসতি নিয়ে—বিদ্যুতের ব্যাপারে, বলা হলো না সেটা।

পোস্ট গেঁথে লাইন টানলেই—'গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণ' হয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের বিরাট অংশের, এটুকু চোখে দেখার সৌভাগ্য হয় নি।

ভারত সরকারের পারমাণবিক দপ্তর যখন পশ্চিমবঙ্গের কাঁথিতে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র বাতিল করলো—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে বলে বসলো নানা সম্ভাব্য জায়গার নাম—তার মধ্যে ক্যানিঙও রয়েছে। ক্যানিঙ যে অঞ্চলে সেখানে বাসন্তী থেকে আরো দক্ষিণে কোনো অঞ্চলে বিদ্যুতের খুঁটি পর্যন্ত নেই। সম্ভাব্য এই নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র বেহায়ার মতো বঞ্চিত অঞ্চলের দ্রষ্টব্য হয়ে থাকতো। তাই থাকে—কারণ, ওটার থেকে বিদ্যুৎ চলে আসতো পাকা শিল্পপতি আর সুশিক্ষিত মানুষদের সেবা করতে।

এমন একটা স্কিজোফ্রেনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দেশে—ঘরোয়া ব্যবহারের জন্যে বিদ্যুতের সমস্যা কতোখানি, প্রশ্ন তোলে না উপদেষ্টারা, বরঞ্চ নিউক্লিয়ার কর্মসূচীতে মহানন্দে অফুরন্ত দেশের টাকার শ্রাদ্ধ করা, আর বিদেশী মহাজনদের কাছে ধর্না দেওয়া।

হোমি ভাবা-মশাই 1956 সালে তারাপুরের প্লুটোনিয়াম প্ল্যান্ট উদ্বোধন করতে গিয়ে—উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো আমেরিকা ও কানাডার। তার আগে থেকে ভারত—1956 থেকে 1973 পর্যন্ত, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটাবার আগে পর্যন্ত—কমপক্ষে একুশটা দেশের সাথে চৌত্রিশটা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তার মধ্যে আছে আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা ও তেরোটা ইয়োরোপের দেশ—আর পাঁচটা তৃতীয় বিশ্বের। বেশীরভাগই সাহায্য চেয়ে—মাত্র কয়েকটাতে (আফগানিস্তান, ফিলিপিন্‌স্ ইত্যাদিকে) সাহায্য দিয়েছে। হৈ চৈ করে 'ভারতীয় বোমা' ফাট্‌লো—না বোমা না, 'বিস্ফোরণ'। কারণ সাহায্য বন্ধ হওয়ার ভয় ছিলো। অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থায় বেশ বড়ো করে বেরোতো 'বিজনেস্ স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায়—ভারত কানাডাকে বোঝাচ্ছে, সাহায্য যেন বন্ধ না হয়, ক্যানাডার সাহায্য বন্ধ হলে ভরাডুবি। নিখাদ এক নিউক্লিয়ার সমর্থকের লেখায়—তারাপুরে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের 66.3% যন্ত্রপাতি বিদেশী; রাণাপ্রতাপ সাগর কেন্দ্রে প্রথমটায় 61% আর দ্বিতীয়টায় 35.6% বিদেশী; কলপক্কম্ নাকি 20.3% বিদেশী যন্ত্রপাতিতে তৈরী করা যাচ্ছে।

ভেতরে ভেতরে কতো কী হচ্ছে কে জানে। বিহারে যদুগুড়ায় নতুন ইউরেনিয়াম খনির যে সব যন্ত্রপাতি বিদেশী—সেটা ভারতীয় কোম্পানীর মাধ্যমে ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন কিনবে। ব্যস্—আমরা জানলাম না, ওটা বিদেশী। বিদেশী ব্যবসায়ীরা শুধু নয়, ছিঁচকে চোরাইমালের দালালরাও খুব খুশী—ভারতের নিউক্লিয়ার কর্মসূচীতে। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ঠিক আগে ও পরে বিদেশে 1974 সালে প্রকাশ হয়ে পড়েছিলো নেপালে, ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে ব্যবহার্য ইউরেনিয়ামের চোরাই কেনা-বেচা হচ্ছে। এই তো কয়েক মাস আগে, এ বছর ঠিক একই খবর।

অতি বোকারাও বিশ্বাস করে না—নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ আসবে। সবচেয়ে বিশ্বাস করে না ব্যবসায়ীরা। বিদ্যুৎ-বিহীন নিউক্লিয়ার কর্মসূচীতেই তাদের লাভ—তাই তারা চুপ করে পাঁচ কষে বেশী করে শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলার। অ্যামরি লভিন্স দেখিয়েছিলো—নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের ব্যবসা যখন শিল্পোন্নত দেশে খাপ খুলতে পারছে না, তখন বিদেশে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বে তারা সেগুলো রপ্তানি করছে

(ভারত সমেত)। এই তো এ বছর জুলাই মাসে আমেরিকার ব্যবসায়ীদের পত্রিকা 'বিজনেস্ উইক'-এ বেরিয়েছে—আমেরিকা নতুন নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র খুলতে ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস উঠছে। এমন অবস্থায় ভারতের মতো এমন চমৎকার মৃগয়াভূমি আর কোথায়? যেখানে যা-ইচ্ছে-তাই করা যায়।

'ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক্‌লি'-তে কয়েক বছর আগে বেরোলো—হায়দারাবাদে নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেক্সের কাছের স্কুলের ক'টি ছাত্র বিকিরণে আক্রান্ত। আমরা তো চুপ করেই ছিলাম। বিদ্যুতের সমস্যা নিয়ে নিউক্লিয়ার ভাঁওতাতেও আসে যায় না।

যাদের হাতে আমরা

খুশী ব্যবসায়ীরা। খুশি রাজনীতিক নেতারা। সে খুশীর ভাগ বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ্‌দেরও।

কয়েক বছর আগে ভাবা এ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার (BARC) থেকে যে বাঙালী (ব্রাহ্মণ) বিজ্ঞানী DANIDA (ডেনিস আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা)-র বৃত্তি নিয়ে ডেনমার্কে সস্ত্রীক কাটিয়ে এসেছে—তার খুড়ো-শ্বশুর BARC-এর উচ্চপদস্থ চাকুরে। অতএব, বাঙালী বিজ্ঞানীর ডেনমার্ক থেকে ফিরে এলো পদোন্নতি বাঁধা। শুধু একটু অসুবিধে—স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদানুযায়ী আসবাবপত্রের অভাব। অতএব বিজ্ঞানী দম্পতি দেশে ফিরে এলো—সমস্ত বৃত্তির সময়কালে সংগৃহিত—ফ্রিজ, টিভি, কুকিং-রেঞ্জ ইত্যাদি হাজার জিনিস জাহাজভর্তি করে।

এই দম্পতির বন্ধু অ-বাঙালী ভারতীয়, একই বৃত্তিভোগীর শিশুপুত্র ডেনমার্কে ওই সময় অপুষ্টিজনিত কারণে অসুস্থ হলো—তার স্ত্রী ডাক্তারকে বলে, স্বামীটি শিশুদের না খাইয়ে টাকা জমাচ্ছে। এই স্ত্রী নিজেই শিশুটির জন্যে খাবার, পরে জোগাড় করে আনে—ডেনমার্কের দোকান থেকে চুরি করে!

এরাই দেশে ফিরে আসে—আমাদের দেশের নিউক্লিয়ার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যে। ওপরের ঘটনায় আমার কোনো আপত্তি নেই—যদি ভারতের কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ এর সাথে জড়িয়ে না থাকতো। যদি এদের হাত দিয়ে শক্তি সমস্যার সমাধান, নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের ডিজাইন, নিউক্লিয়ার বোমার মশলা না বেরোতো।

আমরা স্রেফ কিছু স্বার্থপর বুদ্ধিমানের কব্জায় পড়ে গেছি। সমীক্ষা, তথ্য, যুক্তির অপেক্ষা আর ভারতীয় নিউক্লিয়ার কর্মসূচী করে না।

ঠিক তেমনি বোমার নায়েবরা। হোমি ভাবা থেকেই বেশ জমিয়ে ভারতের হাতে নিউক্লিয়ার বোমা দেওয়ার ইচ্ছে চলছে—সেটা ইদানীং ঘোরতর বাস্তব হয়ে উঠছে। আর উস্কানি দিচ্ছে আজব সব পরামর্শদাতারা। ইদানীং ভারতের খানদানী প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরামর্শের পত্রিকা 'স্ট্রাটেজিক অ্যানালিসিস' পড়ছিলাম—এক অতি-নক্ষত্র কে. সুব্রাহ্মণ্যম প্রায়ই বিদেশে যে সব প্রবন্ধ পাঠ করে এসেছে, পড়ছিলাম। অন্যত্র, যেমন 'ইন্ডিয়ান এ্যান্ড ফরেন রিভিয়ু', বা 'দি উইক' পত্রিকায় এই পরামর্শদাতাদের লেখা পড়ছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য—এদের পরামর্শে বোমা তৈরী হবে! এদের লেখায় কখনো সম্পূর্ণ চিত্র, বা একটা সমতা বজায় রাখা যুক্তি পাওয়া যায় না। ঠিক যেন—পার্লামেন্টে কোনো রাজনীতিক ফড়ে বক্তব্য রাখছে। যেমন—অক্সফোর্ডে পঠিত সুব্রাহ্মণ্যমের প্রবন্ধ। সরল সহজভাবে বলে দিলো—1971 সালে আমেরিকা কূটনীতিক চাল দিয়ে 'এন্টারপ্রাইজ' জাহাজ ভারত মহাসাগরে ঢোকালো। এতোই সহজ ব্যাপারটা? না কি সামরিক হস্তক্ষেপ? জ্যাক এ্যান্ডারসন্ ঠিক এ বিষয়েই আমেরিকার বহু গোপন মিটিংয়ের রেকর্ড প্রকাশ করে দেয় পত্রপত্রিকায় (যা এ্যান্ডারসন্ পেপার্স বলে খ্যাত)। তার থেকে আমরা চিত্র পাই—আমেরিকা, পশ্চিম পাকিস্থানকে হারতে দিতো না যেন-তেন-প্রকারেন। পরে জানতে পারি—আমেরিকা নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে দরকার হলে পাক-ভারত যুদ্ধ থামাতো।

সুব্রাহ্মণ্যমের সহকর্মী পি. কে. এস. নাম্বুদিরি, এক দীর্ঘ তালিকা দিয়েছে এগারোটা দেশের—যারা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার কর্মসূচীকে সাহায্য করছে। মন্তব্য করছে—বোমাটা কতখানি পাকিস্তানী, কতখানি বিদেশী, তা ইতিহাস ঠিক করবে!

আমরা যদি ভারতের বোমা তৈরীতে বিদেশী সাহায্য (নিউক্লিয়ার কর্মসূচীতে যন্ত্রপাতি দিয়ে) তালিকা তৈরী করি—লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাওয়া উচিত। আগে কিছুটা বলেছি, তার সাথে যোগ করুন ভিজে বেড়াল ইলেকট্রনিকস্ কর্পোরেশন অফ্ ইন্ডিয়া লিমিটেডের কথা। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে আপ্লুত বিজ্ঞানীদের (রমান্না, সেঠনা, শেষগিরি ইত্যাদির) প্রশংসাধন্য এ প্রতিষ্ঠানটি BARC-এর সন্তান ও ভারতের 1974 সালের বিস্ফোরণের বহু কাজ করে, এবং এটা ছিলো পারমাণবিক দপ্তরের আওতায়। এখন 'হিন্দু সার্ভে অফ্ ইন্ডাসট্রি'তে—দেখুন—এই ECIL বড় বড় বিদেশী কম্পুটার কোম্পানীর সাথে চুক্তি ও যন্ত্রপাতি আমদানী করে ছাড়া চলে না। এখনও এ প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ প্রতিরক্ষা ইলেকট্রনিক্সের কাজ করে।

বাড়িয়ে লাভ নেই। আমরা ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, রাজনীতিক পরামর্শদাতাদের পাল্লায় পড়ে শঙ্কিত। উপরোক্ত কারণে—বিজ্ঞান সমাজমুখী হবেই, সমাজটা বিজ্ঞানমুখী হবেই। প্রথমটা ধামাচাপা দিতে, দ্বিতীয়টা হাটে হাঁড়ি ভাঙতে।

আর ক'টা বছর

নিউক্লিয়ার শক্তি চাই—কারণ বছর তিরিশেকের মধ্যে কয়লা ও তেল নিঃশেষ হয়ে যাবে! না অতদূর পৌঁছতে হবে না।

বিজ্ঞানীবন্ধুরা—

তার আগেই ভারতের অর্থনীতি ধ্বসে পড়বে বিদেশী ঋণের বোঝায়। ইতিমধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো একজোট হয়ে ভরাডুবি থেকে বাঁচতে চাইছে, জানেন? জানেন ব্রাজিল তার 102 বিলিয়ন ডলার বিদেশী ঋণের বোঝা নিয়ে, ভারতের সাথে একজোট হয়ে দরবার করবে আমেরিকার বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধে। জানেন—তৃতীয় বিশ্ব, বিদেশী ঋণের আসলের থেকে বেশী সুদ দেয়? জানেন—ভরাডুবি এই ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো আশঙ্কা করছে, নির্বিচারে সংঘর্ষ, হাঙ্গামা, রক্তারক্তি?

জানেন ভারতের ব্যবসা অর্থনীতির অভিজ্ঞ মহল ইতিমধ্যে বৈঠক করে ল্যাটিন আমেরিকার সাথে ভারতের সঙ্কট তুলনা করছে?

বিজ্ঞানী ও রাজনীতিক নেতাদের স্বার্থপরতার মাধ্যমে লুঠেরারা নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি, অস্ত্র খাওয়াচ্ছে ভারতে (ল্যাটিন আমেরিকাতেও সমতুল্য অবস্থা)--তারপর?

আমার হিসেবে দশটা বছরের মধ্যে—সমস্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে চলে যাবে এই উপমহাদেশে, যদি ল্যাটিন আমেরিকার সাথে সাবধানে তুলনা করি।

এবছর (1985-86) বার্ষিক বাজেট পেশ করার দেড় মাসের মধ্যে পাইকারী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে 2.4%, অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় 20% হারে। সব থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষের (খাদ্যশস্য, জ্বালানী তেল, যানবাহনের খরচ) দাম বেড়েছে 10% হারে, অর্থাৎ বার্ষিক 80% হারে! সাধারণ মানুষ মূল্য দিচ্ছে—প্রতিরক্ষা, বিদেশী ঋণের সুদ আর শক্তি প্রযুক্তির বিরাট ব্যয়ের।

ফিরে এলাম সেই প্রথম প্রসঙ্গে। হাত পড়ছে খাদ্যশস্যের ওপর। এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ চাপ। সমগ্র ভারতের মানুষের প্রয়োজনের তুলনায়—দ্বিগুণ পিছিয়ে পড়লাম উন্নতির পথে—টোডারোর পরিমাপক দিয়ে।

ভারত ল্যাটিন আমেরিকা হবে—কিছু বছরের মধ্যেই। সমাধান নয়—এ কথাটার পৃষ্ঠে একটাই মানবিক কথা বলতে হয়—এখুনি বন্ধ করতে হবে সাধারণ মানুষের অর্থে পুষ্ট প্রত্যেকটি প্রযুক্তির প্রকল্প॥ এখুনি। একটা টাকাও বিদেশী ঋণ নেওয়া চলবে না। এই মহা-পাপের সব থেকে বড় অংশীদার নিউক্লিয়ার কর্মসূচী—শক্তি বা বোমা, যে কোনো ছদ্মবেশে। এ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির পরিবর্তে ভারতের মানুষদের নিত্যদিনের সমস্যা অনেক বড়ো ভাবনা। না হলে—আর মাত্র দশ বছরে হয়তো, ভারতের বৃহত্তম জনগণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাবে—যেমন যাচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকায়। □

নিউক্লিয়ার অস্ত্র উপমহাদেশে রোধের প্রস্তাব

এদেশে নিউক্লিয়ার অস্ত্র বর্জনের সংগঠন GROUND (গ্রুপ ফর নিউক্লিয়ার ডিজআর্মামেন্ট) প্রস্তাব নিয়েছে, সাম্প্রতিক ভারত-পাক নিউক্লিয় সক্রিয়তা, অভিযোগ, প্রতি-অভিযোগের আবহাওয়ায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে। প্রস্তাবের কপি পাঠিয়েছে ভারত ও পাক সরকারী মহলে, আবার জনবিজ্ঞান গ্রুপগুলির কাছেও। আমরা পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থাও একই মর্মে প্রস্তাব নিয়েছি। প্রস্তাবটি তুলে ধরছি সকলের কাছে। আলোচনা করুন, আপত্তি থাকলে জানান, আর সময় থাকলে এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য প্রচার চালান। সঃ মঃ বি-ও-বি

"দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নিউক্লিয়ার অস্ত্রবিহীন অঞ্চল স্থাপনের জন্য পারস্পরিক বিশ্বাস নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে আলোচনা চালানোর জন্য আমরা ভারত ও পাক সরকারের কাছে বিশেষ দাবী পেশ করছি।

"আমরা মনে করি উপযুক্ত নিরাপত্তার ভিত্তিতে সমস্ত নিউক্লীয় ব্যবস্থার পারস্পরিক তদারকীর মাধ্যমে, আর দুই দেশের মাটিতে নিউক্লীয় শক্তিগুলিকে কোনো সামরিক ঘাঁটি বা নিউক্লীয় অস্ত্র বসাতে না দেওয়ার পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে, কোনো দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থ হানি না করেও এরকম একটি নিউক্লীয় অস্ত্রবিহীন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

"আমরা আরো মনে করি, এই নিউক্লীয়ার অস্ত্রবিহীন অঞ্চল স্থাপন প্রধানত এই দুটি সরকারেরই দায়িত্ব, এবং প্রযুক্তিগত বিচারে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদন সম্ভবপর।" □

পরমাণু বোমার মানসিকতা—ভারতে

রবীন মজুমদার

"ভারত একটি অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং বিশ্বস্ত-সূত্রে প্রকাশ যে ইসরায়েলের অন্তত 30টি নিউক্লিয়ার যুদ্ধাস্ত্র (warhead) রয়েছে; সেগুলি নিক্ষেপ করার ব্যবস্থাও তাদের দখলে। তাছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রায় নিশ্চত-ভাবেই একাধিক নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী অথবা দ্রুত তৈরী করতে সক্ষম। অন্যান্য দেশও যেমন ইরাক, পাকিস্তান, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, লিবিয়া, ইজিপ্ট, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া শীঘ্রই পরমাণু অস্ত্রধর হ'তে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্বে পরমাণু যুদ্ধের সূত্রপাত হওয়া খুবই সম্ভব।" ['As Lambs to the slaughter,' Peace Study Centre, Bradford University, U.K. (Arrow Books, 1981)]

[বর্তমান রচনাটিকে বিষয়টির প্রস্তাবনা বলা যেতে পারে! পরমাণু অস্ত্রের অনুকূলে যে সব যুক্তির ভিত্তিতে জনমত গড়ে ওঠে তার কয়েকটি পর্যালোচনার চেষ্টা হয়েছে এতে। এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা খুব প্রয়োজন। লেখক।]

একদিকে পরমাণু অস্ত্রসম্ভার স্তূপীকৃত হ'চ্ছে, প্রতিযোগিতা চলছে অব্যাহত, চলছে অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক শান্তিচুক্তির মহড়া, আর অন্যদিকে পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ চিন্তিত ব্যথিত মথিত হৃদয়ে নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনে ক্রমশ বেশী বেশী সংখ্যায় সামিল হ'চ্ছে। মাপে ছোট কিন্তু তাৎপর্যে বিরাট কিছু কিছু সাফল্য মিললেও কিন্তু এই সব নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলন বিশ্বজোড়া পরমাণু অস্ত্র-পরিস্থিতিতে ব্যাপক কোন পরিবর্তন এখনও আনতে পারে নি। পরমাণু শক্তিধর ও শক্তিকামী দেশগুলির সরকারী নীতি ও কার্যক্রমের উপর এই আন্দোলনের প্রভাব এখনও খুবই সীমিত। এহেন পরিস্থিতিতে পাকিস্থান ও ভারতের সাম্প্রতিক নিউক্লিয়ার গতিবিধি বিশেষ পর্যালোচনার দাবী রাখে।

পরমাণু অস্ত্রের ভয়াবহ ধ্বংসক্ষমতা, আয়নকারী বিকীরণের অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য দীর্ঘস্থায়ী কুফল, মনুষ্যবাসযোগ্য একমাত্র এই গ্রহ পৃথিবীতে জীবের অবলুপ্তির সম্ভাবনা, ইত্যাদি কোন যুক্তিই আপাতদৃষ্টিতে সরকারী নীতি প্রণয়নকারীদের তথা রাজনীতিবিদদের মনে খুব একটা দাগ কাটছে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, তাঁদের কাছে এই সব যুক্তি নিছকই 'আদর্শবাদী শান্তিকামী'দের তাত্ত্বিক যুক্তি। শান্তিকামীরা বিপদের সম্ভাবনাকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করেন এমন কথাও শোনা যায়। তাছাড়া, পরমাণু অস্ত্র দিয়েই পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগ ঠেকানো সম্ভব—এমন একটা ধারণাও রাজনীতিক তথা নীতিনির্ধারকদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে কাজ করছে। কঠোর বাস্তব অবস্থার গভীর পর্যালোচনা করেই অত্যন্ত দুঃখ ও ব্যথা নিয়েই তাদের পরমাণু অস্ত্রাদির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হয় বলে তাঁরা দাবী করেন।

কঠোর বাস্তবতা :

আলোচনাটিকে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করে তোলার জন্য ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যেই সীমিত থাকা যাক। যতদূর বোঝা যাচ্ছে ভারত যদি পরমাণু অস্ত্র তৈরীর সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তা নেবে পাকিস্থানের অনুরূপ সিদ্ধান্তের (বাস্তব বা কাল্পনিক) প্রতি-ক্রিয়াতেই। পাকিস্থান পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হলে নাকি ভারতের—

(1) নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার ঘোরতর আশঙ্কা,

(2) জাতীয় সম্মান ও মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হবে,

(3) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়) গুরুত্ব হ্রাস পাবে,

(4) জনসাধারণের মনোবল ভেঙে যাবে, সাধারণভাবে বুদ্ধি-জীবীদের এবং বিশেষ ভাবে বিজ্ঞানীদের হীনম্মন্যতা অধিকার করবে,

(5) প্রতিরক্ষাবাহিনীও হীনম্মন্যতার শিকার হবে এবং ফলে এমনকি সাধারণ অস্ত্রের সাধারণ যুদ্ধেও তাদের ভীতসন্ত্রস্ত আচরণ হবার সম্ভাবনা।

এছাড়াও যুক্তি দেখানো সম্ভব—

(6) পরমাণু অস্ত্র তৈরীর খরচ ভারতের সাধ্যাতীত নয়,

(7) পরমাণু অস্ত্র প্রকল্প বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক।

বাস্তবতার অন্যদিক

উল্লিখিত প্রথম পাঁচটি যুক্তিকে এক সঙ্গে একটু বিচার করার চেষ্টা করা যাক। মান-সম্মান-মনোবল মাপার ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোন মাপকাঠি নেই। পাকিস্থানেও অনুরূপ যুক্তি দেখানো খুবই সম্ভব। এসব কথা যে কোন দেশের মানুষের মধ্যে সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তুলবে। আর সেন্টিমেন্ট যেখানে প্রবল বিজ্ঞানসম্মত র‍্যাশনাল চিন্তাভাবনা সেখানে দুর্বল হতে বাধ্য।...ভারত ও পাকিস্থানের ক্ষেত্রে খুব সহজেই শিক্ষিত মানুষরাও এ ধরনের সেন্টিমেন্টে আক্রান্ত হন। এটা নিছক প্যাট্রিয়টিজম বা দেশপ্রেম নয়, তারও কিছু বেশী। চীনও ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং অনেক আগে থেকেই চীন পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী। ইতিমধ্যে চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত-সংঘর্ষও হয়েছে। অথচ চীন পরমাণু অস্ত্রধর অতএব আমাদেরও তা পেতেই হবে এমন দাবী ওঠেনি, যেমনটা ঘটছে পাকিস্থানের বেলায়। এর পিছনে রীতিমত সাম্প্রদায়িক

মনোভাব কাজ করছে বলে মনে করাটা অসঙ্গত হবে না। পাকিস্থানের সম্ভাব্য পরমাণু বোমা তো ইতিমধ্যেই 'ইসলামিক বোমা' বলে আখ্যাত হয়েছে এবং কিছু কিছু মুসলিম দেশ তো 'ইসলামিক বোমায়' উদগ্র আগ্রহী।

এইভাবে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার শুরু, তার শেষ কোথায় কেউ বলতে পারে না; পরিণতি ভাবতেও ভয় হয়। পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা একবার শুরু হলে উভয় দেশই চাইবে অন্য দেশের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকতে; উভয় দেশই চাইবে প্রয়োজনে আগাম চরম আঘাত হেনে শত্রু দেশের আক্রমণ সম্ভাবনা স্তব্ধ করতে। অন্তত সেভাবেই চলবে প্রস্তুতি। পরমাণু অস্ত্র দিয়েই পরমাণু অস্ত্র ঠেকানোর যুক্তির পেছনে কাজ করে থাকে এই ধরনেরই 'চূড়ান্ত ধ্বংসের পারস্পরিক নিশ্চিত ক্ষমতা' (Mutually Assured Destruction) অর্জনের তত্ত্ব। এরকম পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষের গতিবিধির আগাম নিশ্চিত খবরের জন্য যান্ত্রিক গোয়েন্দাগিরির উপর ভীষণ ভাবে নির্ভর করতে হয়। বর্তমান বিশ্বে যান্ত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যই পরমাণু যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আর সেদিক থেকে ভারত ও পাকিস্থানবাসীরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের উপর কতখানি আস্থা রাখতে পারেন?

পাকিস্থানের তুলনায় ভারত অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী দেশ। পরমাণু কার্যক্রমে তুলনামূলকভাবে বেশী অভিজ্ঞও ভারত। গান্ধীজীর দেশ বলে এবং ঐতিহ্যগতভাবেও শান্তিকামী বলে ভারত একদা বিশ্বে-বিশেষ সম্মান ও মর্য্যাদার স্থান করে নিয়েছিল। পোখরান বিস্ফোরণ ও অন্যান্য নানা ক্রিয়াকলাপে তা কিছুটা ম্লান হলেও, পাক-ভারতের মধ্যে ক্ষতিকর পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সাম্প্রদায়িক জঙ্গীপনায় ইন্ধন না যুগিয়ে নিজস্ব সদিচ্ছা, সদাচরণ এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির দ্বারাই পাকিস্থানকে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পথ থেকে নিরস্ত করার প্রয়াস পেতে পারে ভারত, হ'তে পারে উপমহাদেশে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও প্রগতির অগ্রদূত।

পরমাণু-অস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে জোরদার করার বদলে দুর্বলও করে তুলতে পারে। সাধারণ প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে ভাঁটা পড়তে পারে; আত্মসন্তুষ্টিও অধিকার করতে পারে। উপরন্তু পরমাণু প্রকল্প মাত্রই এক একটি মূর্তিমান নিরাপত্তাহীনতা; যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বা এমনকি অন্তর্ঘাতমূলক কাজের ফলেও সেগুলি আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজেদের অস্ত্রে নিজেরাই বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। সর্বোপরি পরমাণু-অস্ত্রের কোন সামরিক টার্গেট থাকা সম্ভব নয়, নির্বিচার ধ্বংসই তার বিশুদ্ধ ধর্ম। দেশের জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের মান-সম্মান ও মনোবল নষ্ট হবার কথা বলা হাস্যকর। এতগুলি বছরের প্রজাতান্ত্রিক জীবনেও যা পোক্তভাবে গড়েই ওঠে নি তা কমবে বা ভাঙবে কি করে? অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও সুবিধাভোগী শহুরে ক্ষমতাশীল মুষ্টিমেয় অংশের দম্ভ ও জেদের সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণের সম্মান ও মনোবলকে এক করে দেখা ঠিক নয়।

পরমাণু অস্ত্রধর দেশগুলির মধ্যে অনেকেই—চীন, রাশিয়া, এমনকি আমেরিকাও—বলেছে যে তারা নিউক্লিয়ার অস্ত্রে অনিউক্লিয়ার দেশকে আঘাত করবে না। তাদের মৌখিক আশ্বাসের উপর তেমন গুরুত্ব না দিয়েও আশা করা যায় স্বাভাবিক বোধ ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেরই এই নীতিতে সমর্থন থাকবে। পরমাণু অস্ত্রসজ্জিত ভারত সাধারণ মানুষের এই প্রবল সমর্থন ও সহানুভূতি হারিয়ে কি অন্যান্য পরমাণু অস্ত্রধারী দেশের মতই স্বার্থপর আচরণ করবে? সচেষ্ট হবে, যাতে অন্য কোন দেশ পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী না হয় এবং তার নিজস্ব অবস্থান অটুট থাকে?...দেশের সর্বাংশের মানুষের উন্নতি ও প্রগতিতে প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক রাজনৈতিক শক্তি পরমাণু অস্ত্রের প্রভাবে দাম্ভিক, কর্তৃত্বপরায়ণ ও স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠতেই পারে। জনসাধারণের ন্যায্য বিক্ষোভ আন্দোলনও তখন উপেক্ষা বা দমন করা সহজ হয় বৈকি!

পরমাণু অস্ত্রধর না হয়েও যথেষ্ট উন্নতি, আত্মবিশ্বাস ও মান-মর্যাদার অধিকারী দেশের নজির রয়েছে চোখের সামনেই—জাপান, জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলি কি অনুন্নত, প্রভাবহীন? দেশের মানুষের সত্যিকার উন্নতি, শিক্ষা ও চেতনাই জাতির মান-সম্মান নিরাপত্তার নিশ্চিততম গ্যারান্টি—পরমাণু বোমা বা প্রতিরক্ষার বিশাল বাহিনী নয়, এই সাধারণ সত্যটুকু না বোঝা ভারত ও পাকিস্থানের মত দেশের পক্ষেই বুঝি সম্ভব!

খরচের খাতা

খরচের প্রসঙ্গটি ও পৃথক ও বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। দু-একটি প্রাসঙ্গিক দিকের উল্লেখ না করলেই নয়।

পরমাণু অস্ত্র তৈরীতে উদ্যোগী হ'লে ভারতের ঠিক কি হারে খচর পড়তে পারে? সঠিক হিসেব করা শক্ত, তবে অনেকেই সে চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন হিসেবের মধ্যে বিস্তর ফারাক: নীচের দিকে যেমন বছরে মাত্র 500 কোটি টাকার আনুমানিক হিসেব আছে, উপরের দিকে তেমনি আট দশ হাজার কোটি টাকার অনুমানও করা হয়েছে। হিসেবের সূক্ষ্ম কচকচির মধ্যে না গিয়েও যদি আমরা ধরে নিই যে মাঝামাঝি একটা অঙ্ক—ধরা যাক—বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচ হ'তে পারে, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন আসে—কতদিন এ হারে খরচ করা প্রয়োজন? খরচের বার্ষিক পরিমাণ কি একই থাকবে না দিনে দিনে বাড়বে, নাকি কমবে? বিশেষজ্ঞদের মতামতের একটা অনুমানিক গড় নিয়ে বলা যায় বর্তমান অবস্থা থেকে কার্যকরী ভাবে পরমাণু অস্ত্রধর হয়ে উঠতে ভারতকে বছর দশেক ধরে চেষ্টা চালাতে হবে। খরচের হার থেমে

থাকারও উপায় নেই—কাজে নামলে তা বছর বছর বাড়বেই—যে কোন ভারতীয় প্রকল্পের সেটাই অভিজ্ঞতা। পরমাণু অস্ত্র প্রকল্পের আরও বিশেষত্ব এই যে—শুধুমাত্র বোমা কোনই কাজের কথা নয়। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি নিখুঁত করে তোলার মধ্যেই নিহিত থাকে তার সাফল্য। বস্তুত, খরচের সিংহভাগ হতে হবে সেদিকেই। রিমোট কন্ট্রোল, রাডার, মিসাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সব ক্ষেত্রেই যেমন থাকবে নিরন্তর আরো আরো উন্নত কার্যকরী ও নিখুঁত ব্যবস্থার প্রশ্ন—অস্ত্রের বেলাতেও তেমনি থাকবে আরও উন্নত, আরও বিধ্বংসী করে তোলার নিরন্তর প্রয়োজন। খরচ বাড়তেই থাকবে কি হারে তা বলা মুস্কিল। কিন্তু একবার এগোলে আর পিছনো যাবে না। তবুও ধরে নেওয়া যাক দশ বছর ধরে ভারতকে একই হারে বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকা করে খরচ করতে হবে—তাই যথেষ্ট। প্রশ্ন হ'ল—এটা কি ভারতের পক্ষে অনায়াসসাধ্য ?

মোট জাতীয় আয়ের 4 বা 5 শতাংশ যদি পরমাণু অস্ত্র প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ব্যয় হয় তবে তা ভারতের পক্ষে অনায়াসসাধ্য না সাধ্যাতীত এমন কথা বলা শক্ত যদি না আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া যায় কোন নিরিখে সাধ্যাসাধ্যের বিচার করব।

বস্তুত সাধ্যাসাধ্যের প্রশ্নটি মূলত একটি দৃষ্টিভঙ্গীগত প্রশ্ন। উন্নত মানবসম্পদে বলীয়ান দেশ না বিধ্বংসী অস্ত্রে শক্তিশালী দেশ—কোনটি আমাদের কাম্য ? পাঁচ হাজার কোটি টাকায় ভারতের বহু গ্রামে পানীয় জল, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। প্রশ্ন হ'ল, আমরা তা না করে পরমাণু অস্ত্রের পিছনে ঢালার সাধ্য দেখাব কিনা। যদি দেখাই তবে প্রথম থেকেই দেশের মানুষের বিরুদ্ধেই শুরু হবে অর্থনৈতিক যুদ্ধঘোষণা। সম্পূর্ণ অনুৎপাদক এই বিশাল খরচের বোঝা বইতে হবে দেশের সাধারণ মানুষকেই এবং ঘুরে ফির নানা ব্যবসায়িক সূত্রে মুনাফা জমবে সেই সব সাম্রাজ্যবাদী দেশে যাদের উন্নতির অন্যতম প্রধান উৎস হ'ল অস্ত্র ঘিরে ব্যবসা। যারা সুকৌশলে আঞ্চলিক উত্তেজনায় ইন্ধন জোগায় বরের ঘরের মাসী ও কনের ঘরের পিসী সেজে, যে কোন অনুন্নত তথা উন্নয়নশীল দেশের যুদ্ধসাজের পরিকল্পনায় সবচেয়ে উল্লসিত হয় তারাই।

প্রসঙ্গত, আর একটি কথাও উল্লেখ্য। যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে আধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জামও এখন রীতিমত ব্যয়বহুল ; তুলনামূলক বিচারে পরমাণু অস্ত্র বেশী ব্যয়সাপেক্ষ মোটেই নয়। তা হ'লেই বা কি আসে যায় ? পরমাণু অস্ত্রকে বিকল্প প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম হিসেবে কেউই গণ্য করবে না। প্রতিরক্ষা খরচ যা হবার তা তো হবেই (বরং বাড়বে, দ্রুতহারে !) পরমাণু অস্ত্রের ব্যয় তার উপর বাড়তি।

তবুও 'বোমা মহল' বলবেন—একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু এ খরচ মোটেই আমাদের অসাধ্য নয়! ভল্টোর সেই ঐতিহাসিক উক্তি স্মরণ

কার্টুন সুপর্ন চৌধুরী

লাগিয়ে এইসব বর্জ্য ফেলার স্থানকে সুন্দর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। এখন থেকেই যদি এইভাবে সঠিক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে ভবিষ্যতের ফলাফল হবে ভয়ংকর, সুদূরপ্রসারী। রিহান্দের জল হয়ে উঠবে মৃত্যুর দূত। অথচ এরই কাছে গড়ে উঠবে দশ লক্ষ মানুষের নতুন টাউনশিপ।

থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বেরিয়ে আসা গরম জলকে কমপক্ষে তিন কি. মি. বইয়ে ঠাণ্ডা করে তবে জলাধারে ফেলা উচিৎ। কিন্তু একমাত্র বিন্ধ্যাচল প্ল্যান্টেই এইরকম Cooling Tower-এর ব্যবস্থা আছে। আর সব কারখানাতেই ঐ গরম জল দুই কি. মি.-র মধ্যে রিহান্দের জলে গিয়ে মিশছে। এইভাবে স্থানে স্থানে জলের তাপমাত্রা হঠাৎ হঠাৎ বেশীমাত্রায় বেড়ে গিয়ে জলজ জীবনধারাকে ক্রমশ বিপর্যস্ত করছে। শক্তিনগরে তো 50 cm ব্যাসের একটা পাইপ দিয়ে এই গরম জল মাত্র এক কি. মি. দূরে তেলগওয়া গ্রামের নাবালে পৌঁছে হঠাৎ হঠাৎ বান বইয়ে দেয়, রিহান্দেও পৌঁছায় না।

শতাব্দীর শেষে 25,000 MW বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। High Tension Wire দিয়েও দূরে পাঠানো যাবে না, অথচ জমিয়ে রাখাও যাবে না, খরচ করে ফেলতে হবেই। তাই বিদ্যুৎনির্ভর শিল্প এখন থেকেই বেড়ে চলেছে। এজন্য মধ্যপ্রদেশের Special Area Development Authority (SADA) ইতিমধ্যেই সীধী জেলায় চার হাজার একর জমি Industrial Plot করে নীলাম করেছে। এখানে তৈরী হবে ছোট স্কুটার, খনির যন্ত্রপাতি, রেল ইঞ্জিন, ওয়াগন, কোচ, বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি, তার। এবং পঁচিশ হাজার দক্ষ শ্রমিকের জন্য 133টি গ্রাম উচ্ছেদ করে SADA গড়ে তুলছে নতুন টাউনশিপ। এদিকে, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সহযোগী শিল্প চালু হয়ে গেছে পরিবেশগত পরিকল্পনা ছাড়াই। যথেচ্ছভাবে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস রেণুকুটের Hindalco Aluminium, ওবরার Dhala Cement, রেণুকুটের Kanaudia Chemical, এরা আবার বিষাক্ত বর্জ্য ফেলে শোন নদীর একটা শাখানদীতে, যার জল এতদিন খেত স্থানীয় অধিবাসীরা। ইতিমধ্যেই এর জল খেয়ে কয়েকজন মারা গেছেন। এখন এর জল গরুবাছুরও ছোঁয় না, ভুল করে এর জলে নামলে পা জ্বলে-পুড়ে যায়।

সিঙ্গরৌলীর আশপাশের গাছে গাছে আর আগের মতন নতুন পাতা গজায় না। আমগাছগুলোতে বেশ ক'বছর বউলও আসছে না। আজ যদি জগদীশচন্দ্র বোস বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো প্রমাণ করতেন এই 'উন্নতি' গাছেরাও চায় না। এই অঞ্চলের পাখীরাও সরে যাচ্ছে দূরের জঙ্গলে।

এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনাহীন এত 'উন্নতি' সত্ত্বেও আজও পায় নি এক চিলতে আলো। তবুও প্রথমেই ওদের হতে হয়েছে ভূমিহীন, সহায়সম্বলহীন; আর আজ নিঃশ্বাসে নিতে হচ্ছে বিষাক্ত বাতাস, পান করতে হচ্ছে দূষিত জল। এই পরিবেশ ধ্বংস যজ্ঞের ফলে ধ্বংস হতে থাকবে ক্রমাগত হাজার হাজার হেক্টর জঙ্গল এবং শতাব্দীর শেষে নারকীয় হয়ে উঠবে নৈসর্গিক বিন্ধ্যাচলের আবহাওয়া।

[দিল্লীর সংস্থা "কলপ বৃক্ষ"-এর শ্রীসত্যজিৎ কুমার সিংহের 'ডেভেলপমেন্ট ফর হুম? এ কেস স্টাডি অন সিঙ্গরৌলি' নিবন্ধ অনুসরণ করে লেখাটি তৈরী করেছেন **প্রদীপ দত্ত**।] □

With best compliments from :

M/s S. CHOWDHURY

308, B. C. ROAD,
Borehat,
Burdwan
Ph. No. BDN 2750

With best Compliments from :

DEBASIS GHOSH B.Sc. Ch. (Hons.), M.Sc.

Bolpur Tourist Lodge Road.
(Pravat Sarani)
Bolpur
Birbhum

বিশ্বের মেট্রো-মানচিত্রে কলকাতা

কল্লোলিনী কলকাতা মেট্রো-যুগে পদার্পণ করল। ভবানীপুর-এসপ্ল্যানেড ও বেলগাছিয়া-দমদম এই দুটি সেকশনে শুরু হয়েছে মেট্রো চলাচল। প্রায় ১৫০০০ নিত্যযাত্রী নিচ্ছেন জ্যামযন্ত্রণা থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস–যদিও বর্তমানে দৈনিক মাত্র ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা মেট্রো সার্ভিস চালু রয়েছে।

এক নবযুগের উন্মেষ ঘটেছে মহানগর কলকাতার যানবাহন ব্যবস্থায়। কলকাতার মেট্রো রেল ভারতবর্ষে প্রথম এবং এশিয়াতে পঞ্চম।

পুরোদমে কাজ চলেছে এই প্রকল্পের অন্যান্য সেকশনেও। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে টালীগঞ্জ থেকে এসপ্ল্যানেড ও দমদম পৌঁছতে সময় নেবে যথাক্রমে ১৫ মিনিট ও ৩৩ মিনিট। ফলে এই রুটে বাঁচবে আপনাদের অমূল্য সময়-আসবে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য।

মেট্রো রেল–অগণিত মানুষের কাছে এক বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি

মেট্রো রেলওয়ে কলিকাতা
(ভারত সরকারের একটি প্রকল্প)

naa-MR—84141

শিল্প বিকাশ ও উন্নয়নের ফল ঃ সিঙ্গরৌলী

সমীক্ষা

উন্নতির দোহাই দিয়ে বানিয়ে তুলছি সত্যিকারের নরক। এখানে তিলে তিলে মৃত্যুর হাত থেকে কারুরই রেহাই নেই

প্রকৃতির নৈসর্গিক রাজ্য সিঙ্গরৌলী উপত্যকাকে ঘিরে আছে বিন্ধ্য পর্বতমালা ঃ পূর্ব-পশ্চিমে শৃঙ্গাবলী আর উত্তর-দক্ষিণে কৈমুর। হাজার হাজার বছর ধরে শাল, তমাল, সেগুন, বাঁশগাছে ভর্তি এইখানে শান্ত সরল বনবাসী মানুষ শিকার, ফলমূল আহরণ, পশুপালন আর নদীর পারে চাষ-আবাদ করে খাদ্য সংগ্রহ করতো। আধুনিক পৃথিবী হতে বিচ্ছিন্ন ওরা, এই সেদিনও জঙ্গল-নির্ভর জীবনযাত্রায় ছিল পরম নিশ্চিন্ত সুখী।

উনিশশো চল্লিশ সালে এখানকার সর্বপ্রথম রাস্তা—ষাট কি. মি. লম্বা, তাও কাঁচা—বানালো রেওয়ার মহারাজা গুলাব সিং। উনিশশো ষাট সালেও সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন ছিল একশো মাইল দূরের 'গাড়োয়া রোড'।

এখানে মাটির নীচে আছে পৃথিবীর দ্বিতীয় চওড়া কয়লা স্তর—133 মিটার চওড়া 2000 কি. মি ছড়িয়ে—Geological Survey of India'র হিসাবমত। আরও আছে লোহা, তামা, অভ্র, সীসা, সিলিকন। আছে রিহান্দ, শোন নদীর পর্যাপ্ত জল। এত সম্পদ..... নজরে পড়লো সভ্য মানুষদের।

ষাটের দশকের প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু উদ্বোধন করলেন রিহান্দ বাঁধ ও জলাধার—পঞ্চান্ন কিলোমিটার জুড়ে। বানানো শুরু হলো রেলপথ, স্টেশন—এখন সিঙ্গরৌলীর বুকেই লোক নামায় ওঠায় অমৃতসর-টাটা এক্সপ্রেস, কালকা-হাতিয়া এক্সপ্রেস। ন্যাশনাল হাইওয়ে, স্টেট হাইওয়ে ছড়িয়ে গেছে সবদিকেই জঙ্গল ফুঁড়ে। জাগতে শুরু করেছে আধুনিক ভারতের ENERGY CAPITAL ঃ এ শতাব্দীর শেষে 25,000 থেকে 30,000 M. W. তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে। উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলার 840 বর্গ কি. মি. আর মধ্যপ্রদেশের সীধী জেলার 960 বর্গ কি. মি মিলে মোট 1800 বর্গ কি. মি জুড়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠছে পনেরোটা সুপার থার্মাল পাওয়ার জেনারেটিং স্টেশন, এগারোটা কয়লাখনি, সাতটি পাবলিক আনডারটেকিং, দু'শোর বেশী সহযোগী শিল্প কারখানা এবং দশ লক্ষ মানুষের বাসযোগ্য টাউনশিপ।

এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সঙ্গে তাল রাখতে শুরু হয়ে গেল জমি থেকে শতশত বছরের আদি বাসিন্দাদের বসতি উচ্ছেদ। 1960এ রিহান্দ বাঁধ আর জলাধার তৈরীর সময় একশো পাঁচটি গ্রামের পঞ্চাশ হাজার মানুষের স্থানান্তর দিয়ে শুরু। দ্বিতীয়বার হয় কয়লা খনিগুলোর জন্য জমি দখলের সময়। তৃতীয়বার হয় থার্মাল পাওয়ার জেনারেটিং স্টেশনগুলোর প্ল্যান্ট আর কলোনী তৈরীর প্রয়োজনে। চতুর্থবার শুরু হয়েছে ঐ বিরাট টাউনশিপ গড়ে তোলার জন্য। এইভাবে স্থানীয় আদি বাসিন্দারা আর ফিরে পায় না তাদের জমিজিরেত। অনেকে আবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে টাকা পায় তা দিয়ে সংসার চালিয়ে (!) জীবনে আর প্রয়োজনীয় জমি কিনে উঠতে পারে না। এইভাবে মোট চোদ্দ হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ—কেউ কেউ একাধিকবার—ভিটেমাটি হারাতে বাধ্য হয়েছে। এখনও হচ্ছে—সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকার জন্য।

এই উপত্যকায় দ্রুত প্রসারমান শিল্পোন্নয়ন অস্বাভাবিক পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি করা ছাড়াও যুগ-যুগান্তর ধরে বসবাসকারী এই সব শান্ত সরল মনুষদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব নিঃশেষে ধূলিসাৎ করে জেগে উঠছে সর্বগ্রাসীর মত। ওদের অতীতের পরিবেশে প্রচলিত জীবনযাত্রা অচল হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। শতশত বছরের জন্মভূমিকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছে আরও দূরের কোনও বনের গভীরে। আর অতীতের আশাবাদী কৃষিজীবি-বনজীবী যারা রয়ে যাচ্ছে তারা শেষমেশ হয়ে উঠছে আজকের আশাহত শ্রমিক ঃ প্রতিদিন দশ-বারো ঘণ্টা কাজ করে মাস গেলে মেরে-কেটে দু-তিনশো টাকার কণ্ট্রাক্ট লেবার। ওরা খনিতে নামে টুপি-জুতো-গ্লাভস ছাড়াই। মাটির ওপরে জমা কয়লার চাঙড় আনা-নেওয়া আর মাপ মত ভাঙ্গার কাজ করে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক, যাদের বেশীরভাগটাই পনেরো থেকে আঠারো বছরের ছেলেমেয়ে। এদের চোখ কান গলা বুকের অসুখ লেগেই আছে, চিকিৎসার কোনও সুযোগ / ব্যবস্থা নেই। ওরা না পায় দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, না পায় পানীয় জল—প্রাকৃতিক ঝরনাই ভরসা। আর শ্রমদানের এই প্রতিযোগিতায় পেছিয়ে পরা মানুষেরা বেছে নেয় বাবুর বাড়ীর চাকর-ঝির কাজ, দোকান-ধাবায় 'বয়'-এর কাজ, কেউবা দেহ বেচে, হারিয়ে যায় কাছে-পিঠের বা দূরের শহরে বন্দরে। অথচ উনিশশো ষাট সালেও কেউ এ অবস্থা কল্পনাও করতে পারতো না। তখন সারাদিন ক্ষেতে কাজ করার পর পেত ভরপেট খাওয়া ছাড়াও এক সের মোটা আনাজ অথবা খাওয়া বাদে তিন সের মোটা আনাজ। তখনও জহরলাল নেহেরু স্বপ্ন দেখতেন—রিহান্দ বাঁধ উদ্বোধনের সময়ে ঘোষণা করেছিলেন, এখানে গড়ে উঠবে আধুনিক ভারতের সুইজারল্যাণ্ড। অথচ আজ এত বছর পরেও, এত উন্নতি সত্ত্বেও, সেই সব স্থানীয় মানুষেরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তো দূরের কথা এমনকি বিদ্যুৎবন্যার ছিটে ফোঁটা এক চিলতে

আলোও পাচ্ছে না। প্রদীপের নীচের অন্ধকার আরও গভীর হয়ে উঠছে। যতই উন্নতি হচ্ছে ততই উড়ছে কোটি কোটি টাকা, আর দাম বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের। দূরের শহরের থেকে এখানে প্রতিটা জিনিসেরই প্রায় দ্বিগুণ দাম। আর এভাবেই দিনের পর দিন এখানকার আদি বাসিন্দাদের বেঁচে থাকাটাই আরও দুঃসহ হয়ে উঠছে।

এখানে কয়লার সঞ্চয় আছে 900 কোটি টন। 1980-81 তে উৎপাদন হয়েছে 60 লক্ষ টন। 2000 সালে উৎপাদন ধরা হয়েছে বার্ষিক 3 কোটি টন। বর্তমানে চালু আছে সাতটা খনি। ক্রমশ আরও চারটে শুরু হবে। এইভাবে বাঁধ, জলাধার, খনি আর থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়ে তোলার জন্য এরই মধ্যে শতশত হেক্টর জঙ্গল সমূলে ধ্বংস করে চেঁছে সাফ করে ফেলা হয়েছে। পুরো পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও শত শত হেক্টর জঙ্গল সাফ করে ফেলতে হবে এ শতাব্দীতেই। কৈমুর হিলস এখনও যদিও রিজার্ভ ফরেস্ট অঞ্চল, তবুও মাঝে মাঝে বহু দূর থেকেও দেখা যায় ধূলার মেঘ—রাস্তা বা খনির জন্য এলোপাথারিভাবে ডিনামাইট বিস্ফোরণের ফল। এরই মধ্যে এই সব চালু খনি, প্ল্যান্ট আর ফ্যাক্টরী সৃষ্ট দূষণের ধাক্কায় বৃষ্টির পরিমাণ কমতে শুরু করেছে, জমির top soil নষ্ট হয়ে মাটি ক্রমশঃ অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জঙ্গল। ইতিমধ্যেই সিঙ্গরৌলীকে খরাপ্রবণ এলাকা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। শতাব্দীর শেষে অবস্থা কোথায় পৌঁছাবে ভালই বোঝা যাচ্ছে।

এখানে National Thermal Power Corporation (NTPC) গড়ে তুলছে 12টা জেনারেটিং স্টেশন। প্রতিটারই উৎপাদন ক্ষমতা 2000 MW.। এখনও পর্যন্ত চালু করেছে মাত্র তিনটে : শক্তিনগরে (এখন উৎপাদন করেছে 1,000 MW), বিন্ধ্যাচলে এবং বীজপুরে। উত্তর প্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের (UPSEB) একটা চালু আছে ওবরাতে। আর একটা গড়ে তুলবে অনপরাতে, ক্ষমতা হবে 130 M.W.। আর বিড়লাদের আছে পেনুসাগরে, উৎপাদন ক্ষমতা 185 MW.। 1983-তে মুনাফা করেছে 20 কোটি টাকা : লাভের অঙ্কে সবার ওপরে। চিমনির ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণেও কিন্তু ওরা এখানে সবার ওপরে।

এক জায়গায় এতো কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষার দিক থেকে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে আপত্তি জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। তবে আপত্তি সত্ত্বেও আগামী শতাব্দীর প্রথমদিকে যখন এই পনেরোটা থার্মাল পাওয়ার জেনারেটিং স্টেশন 25,000 MW উৎপাদন করতে জোর কদমে চলবে, তখন পরিবেশ দূষণও হবে অবিশ্বাস্য দ্রুত হারে।

এখানকার কয়লায় আছে 0·35% গন্ধক, আর পোড়ার পরে থাকে কয়লার 30% ছাই। 1000 MW বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পোড়াতে হয় কমপক্ষে 25,000 টন কয়লা। চিমনির ধোঁয়া বাতাসের টানে 15কি. মি. পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায় কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, সিলিকন ডাই-অক্সাইড, সিলিকন ট্রাই-অক্সাইড ইত্যাদি। এগুলো চোখ গলা বুকের রোগ সৃষ্টি করে দিনের পর দিন ধীরে ধীরে। একমাত্র NTPC-র শক্তিনগরের প্লান্টেই Electrostatic Precipitators (ESP) আছে নানান গ্যাস এবং ছাই আটকানোর জন্য। অন্য স্টেশনগুলিতে শুধু ভিজে চটথলে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এই ধরনের ESP শুধু বড় অণুগুলিকেই ধরতে পারে, ছোট অণুগুলো গ্যাস ও ধোঁয়ার সঙ্গে পালায়, বাতাসে মিশে যায়। অথচ, আজকের বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবীর অনেক দেশে এইসব গ্যাসগুলিকেই শিল্প-উৎপাদনের আনুষঙ্গিক কাজে লাগানোর সুব্যবস্থা আছে।

The Central Board for the Prevention and Control of Air & Water Pollution (CBPCAWP) হুঁশিয়ার করে দিয়েছে— কোনও Rural Industrial Zone থেকে যেন প্রতি ঘন মিটারে 0·38 mg-র বেশী সালফার ডাই-অক্সাইড এবং 0·2 mg-র বেশী suspended particulate matter (SPM) বাতাসে না মেশে। অথচ Tata Energy Research Institute-এর ডঃ ডি. পি. আহুজার নিরীক্ষা অনুযায়ী সিঙ্গরৌলীর স্থানে স্থানে CBPCA-WP-র হুঁশিয়ারী মাত্রার চেয়েও সালফার ডাই-অক্সাইড দূষণ 10 গুণ এবং SPM দূষণ 40 গুণ বেশী। শুধুমাত্র পাঁচটা থার্মাল প্রজেক্টেই এই অবস্থা। আরও দশটা থার্মাল প্রজেক্ট চালু হলে, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক সহযোগী শিল্প গড়ে উঠলে, তখন কী ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হবে তা কল্পনার বাইরে। পশ্চিমের দেশে যেমন মাঝে মাঝে অম্ল বৃষ্টি হয় তেমনটি ঘটবে আমাদের দেশেও। ডঃ আহুজার মতে, কয়লা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জল দিয়ে ধুয়ে নিলে সালফারের ভাগ কমবে এবং ঐ জলকেও আবার পরিষ্কার করে নিয়ে তবেই জলাধারে পাঠানো চলবে। কিন্তু এ সমস্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা আজও শুরু হয়নি।

শতাব্দীর শেষে 25,000 MW বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য প্রতিদিন ছাই জমবে 6,25,000 টন। এত ছাই রাখা হবে কোথায়? কিভাবে? এখনই ছাই মেশানো জল এবং অন্যান্য বর্জ্য রিহান্দের আশে পাশে হেলা-ফেলায় করে ছড়িয়ে ফেলা হয়। এগুলো চুইয়ে চুইয়ে আসায় রিহান্দের জল ইতিমধ্যেই দূষিত হয়ে উঠছে। চারপাশের গ্রামগুলিতে দেখা দিচ্ছে পেটের নানান রোগ। একবার মহামারীও হয়ে গেছে। রিহান্দের জলে জলজ প্রাণীও ক্রমশ কমে আসছে। এমনকি মশাও আর ডিম পারে না। The Environmental Planning & Co-ordination Organisation of Madhya Pradesh-এর শ্রী কে. সি. মাথুরের মতে এইসব বর্জ্য চুইয়ে এসে শুধুমাত্র রিহান্দকেই দূষিত করছে না, আশপাশের পুকুর কুয়োও দূষিত হয়ে পড়বে। আর শুখা মরশুমে এইসব বর্জ্যগুলো বাতাসের সঙ্গে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে, সৃষ্টি করছে চর্মরোগ, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি। জার্মান ও বৃটেনে উপযুক্ত প্রযুক্তিকে কাজে

করা যায়—পাকিস্থানবাসীকে ঘাস খেয়ে থাকতে হ'লেও পরমাণু বোমা চাই!

উন্নয়ন-সহায়ক বোমা

শ্রীমতী গান্ধী প্রায়ই বলতেন, ভারতের মতো বিশাল দেশে মহাকাশ গবেষণা যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটাতে পারে, সমুদ্রবিজ্ঞান আমাদের খাদ্য ও খনিজের যোগান বাড়াতে পারে, ইত্যাদি। পরমাণু প্রকল্পাদির বেলাতেও সেই যুক্তির জের টেনে বলা হয়—এ খাতে খরচ মোটেই অপচয় নয়; বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে এতে।

পরমাণু অস্ত্রের শান্তি-সহায়ক ভূমিকার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এখন দেখা যাক উন্নয়ন-সহায়ক ভূমিকার যুক্তিটি কতটা গ্রহণযোগ্য।

প্রথমেই আসে পরমাণু-বিদ্যুতের প্রসঙ্গ। শক্তি সমস্যার সমাধানে পরমাণু-বিদ্যুৎ একমাত্র বিকল্প—একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা হচ্ছে, এবং সাধারণ মানুষের মনেও স্বভাবতই আশা জাগিয়ে তুলছে। দু হাজার সালের মধ্যে দশ হাজার মেগাওয়াট পরমাণুবিদ্যুৎ উৎপাদনের এক বড়সড় প্রকল্পও ভারত ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছে। কিন্তু হায়, শেষ পর্যন্ত কতটা বিদ্যুৎ তৈরী হবে আর কতটা উন্নয়নের কাজে লাগানো যাবে তা নিয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ অবশ্যই আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আর প্রকৃত উৎপাদন এক নয়। ভারতে চালু রিয়্যাক্টরগুলি থেকে তাদের ক্ষমতার এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্রই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এবং তার দ্বারা পরমাণু শক্তিকেন্দ্রগুলির প্রয়োজনটুকুও মেটে কিনা সন্দেহ।

অনেকে হয়তো মনে করছেন, বোমা বা অস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে আবার বিদ্যুৎ নিয়ে টানাটানি কেন? যদি বলা হয় পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি পরমাণু অস্ত্র প্রকল্পের প্রস্তুতিপর্ব, তবে অনেকেই হয়তো হৈ হৈ করে উঠবেন। কিন্তু তথ্য কি বলে?

পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রিয়্যাক্টর থেকে উপজাত হিসেবে পাওয়া যায় প্লুটোনিয়ামের বিশেষ আইসোটোপ যা অ্যাটম বা ফিশন বোমার প্রধান উপকরণ। অবশ্য অন্য দেশের সহযোগিতায় তৈরী রিয়্যাক্টর থেকে যে প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায় তা আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধের আওতায় পড়ে এবং বোমা তৈরীর কাজে তাকে লাগানো দুরূহ। তার জন্য চাই সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্বে বিধিনিষেধ মুক্ত প্লুটোনিয়াম পাবার উপযুক্ত রিয়্যাক্টর। ভারতের সাম্প্রতিকতম রিয়্যাক্টর 'ধ্রুব' সেরকমই একটি রিয়্যাক্টর (তাও আবার শোনা যাচ্ছে অকেজো হয়ে পড়েছে!); অবশ্যই তা শান্তিপূর্ণ গবেষণার জন্যই, কিন্তু জ্ঞাতিশত্রু পাকিস্থান যদি মানতে না চায়?

পরমাণু উৎসাহীরা নিশ্চয় বলবেন—নিজস্ব দক্ষতা ও কারিগরী জ্ঞান দিয়ে যদি আমরা পরমাণু বিদ্যুৎ এবং হ্যাঁ, এমনকি বোমাও বানাতে পারি তাহ'লে তা কি প্রচন্ড এক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির তথা সাফল্যের নজির নয়? আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদিতেও অনুরূপ দক্ষতা অর্জিত হবে এবং তার ছাপ কি সামাজিক উন্নয়নে পড়বে না? তত্ত্বগত ভাবে একথা অস্বীকার না করেও বলা যায়—বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মাপকাঠি পরমাণু বিদ্যুৎ বা অস্ত্র নয়—অন্য কিছু। পরমাণু প্রকল্প দেশের একাংশ বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীর অর্থ-প্রতিপত্তি প্রভূত বাড়িয়ে দেবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দ্যোতক হ'তে পারে না···অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যদি নামতেই হয় তবে সরাসরি উন্নয়নমূলক কাজে তা হয় না কেন? কেন নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বারে বারে টাকার অভাবে বা পরিচালনার দোষে বা অন্য কোন কারণে মাঝপথে থেমে যায়?

বস্তুত, বোমা-লবি দেশের সমস্ত ত্রুটি ও পশ্চাদপদতার দাওয়াই হিসেবেই পরমাণু অস্ত্রের দাবি তুলতে পারে—আমরাও কি তাতে সায় দেব? □

নিউক্লিয়ার "ওয়ারগেমস" ও "দি ডে আফটার"

"ওয়ার গেমস" ও "দি ডে আফটার ছবি দুটির কথা এখন আর অজানা নয় কারো কাছে। সারা পৃথিবীতেই পরিচিত—নিউক্লিয় যুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র হিসেবে। বৃটেনের CND (Campaign for Nuclear Disrmament) গ্রুপের প্রচার আন্দোলনের হাতিয়ার "ওয়ার গেমস" নামের ছবিটি। **পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে দুটি ছবিরই কপি—ভিডিও ক্যাসেটে পশ্চিমবঙ্গের পিপ্‌লস সায়েন্স গ্রুপগুলি তাদের প্রচার আন্দোলনে ব্যবহার করতে পারেন ছবি দুটি।**

অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ক্যাসেট নিয়ে যান। সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে পারলে ভাল। অনুষ্ঠানের আগে পরমাণু যুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা রাখুন। একজন কেউ ছবি দুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখুন দর্শকদের কাছে। যেহেতু বিদেশী পটভূমি এবং ইংরেজী ভাষায় রচিত ছবি—শুরুতে ছবির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলে জানিয়ে দিলে বুঝতে সুবিধে হবে এবং ভালো লাগবে।

অনুষ্ঠান শেষে সময় থাকলে আগ্রহী দর্শকদের সাথে আলোচনার পরিবেশ তৈরী করতে পারলে ভাল হয়। নিজেদের থেকেই গোড়াতেদু' একটি প্রশ্ন তুলে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন। আলোচনা টেনে আনুন আমাদের দেশের পরিসরে। এ প্রশ্ন আজ জরুরী। একথা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, ভুয়ো আতংক ছড়িয়ে শাসকবৃন্দ পরমাণু কার্যক্রমে আমাদের মত সাধারণ মানুষের সম্মতি আদায় করে নেয়। পরমাণু কার্যক্রমের একমাত্র লক্ষ্য দেশী বিদেশী ব্যবসায়ী স্বার্থ। বিষয়টি যত বেশী আলোচিত হয় ভাল। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ও "বিজ্ঞানকর্মী" পত্রিকা আপনাদের উদ্যোগে পাশে থাকতে আগ্রহী।

আমাদের প্রকাশিত "হিরোশিমা নাগাসাকি কি চাই না" বইটি পরমাণু বিরোধী প্রচারে সহায়ক হবে আশা রাখি।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

অনন্ত জ্যোতি

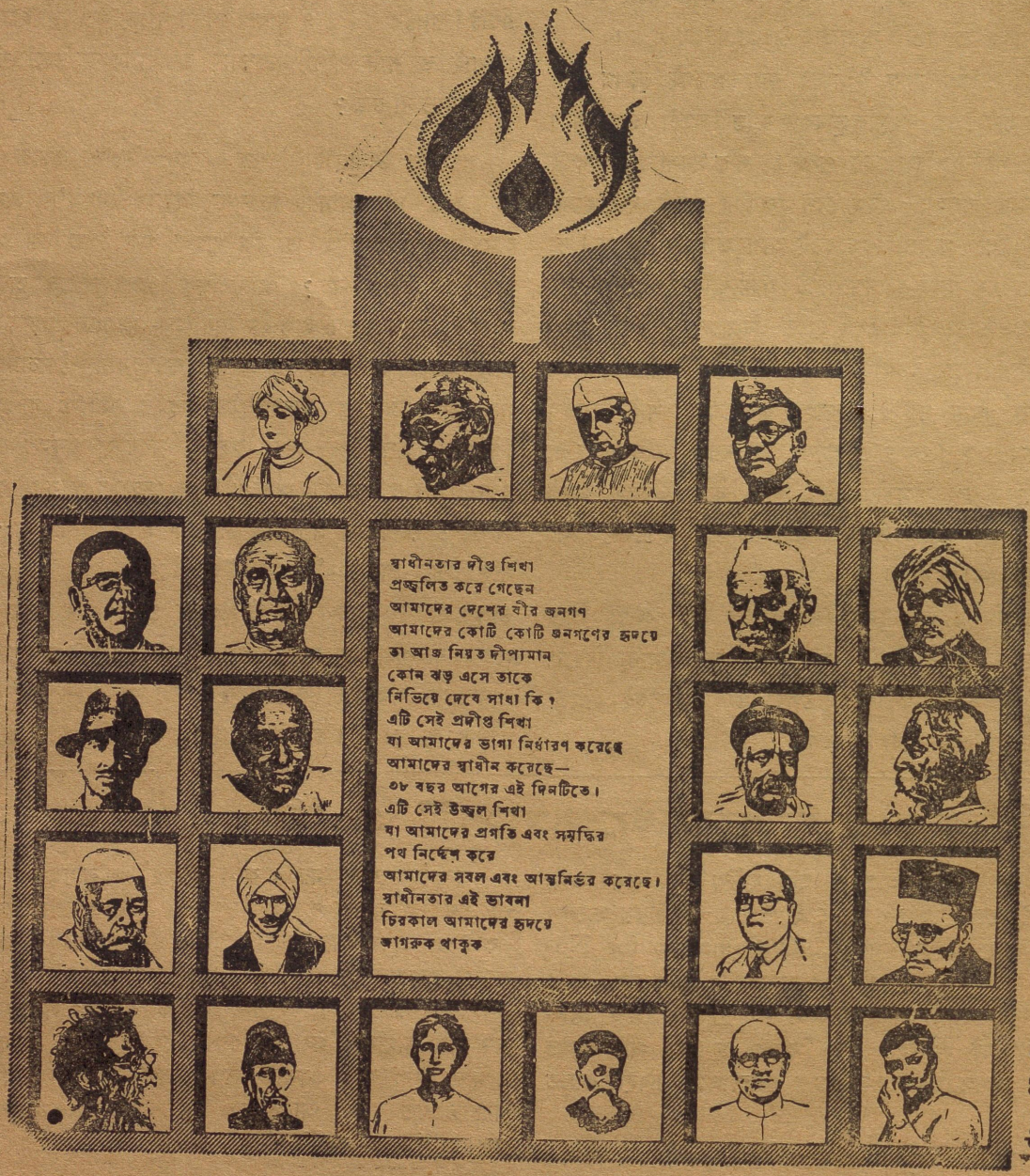

স্বাধীনতার দীপ্ত শিখা
প্রজ্বলিত করে গেছেন
আমাদের দেশের বীর জনগণ
আমাদের কোটি কোটি জনগণের হৃদয়ে
তা আজ নিয়ত দীপ্যমান
কোন ঝড় এসে তাকে
নিভিয়ে দেবে সাধ্য কি ?
এটি সেই প্রদীপ্ত শিখা
যা আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে
আমাদের স্বাধীন করেছে—
৩৮ বছর আগের এই দিনটিতে।
এটি সেই উজ্জ্বল শিখা
যা আমাদের প্রগতি এবং সমৃদ্ধির
পথ নির্দ্দেশ করে
আমাদের সবল এবং আত্মনির্ভর করেছে।
স্বাধীনতার এই ভাবনা
চিরকাল আমাদের হৃদয়ে
জাগরুক থাকুক

davp 85/164

ডেনমার্কের নিউক্লিয়ার-বিরোধী আন্দোলন ও সফলতা

এটা তো ঈর্ষার কথা নয়, বরঞ্চ বুকভরা আনন্দের কথা—যখন ডেনমার্কের পার্লামেণ্ট থেকে সিদ্ধান্ত নিলো গত 29 মার্চ 1985 সালে—

ডেনমার্কে নিউক্লিয়ার শক্তি বাতিল।

ঈর্ষা নামক খারাপ কথাটাই প্রথম মনে আসলো, কারণ—কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের, এমন কি বেশ নীচতলার কাজকর্মে সফলতা (বা শেষ ফলাফলে) প্রায়ই আমাদের সব থেকে স্থূল স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই—'বাবাঃ! কী দারুণ!'

'ইস্! আমি বা আমরা ও রকম যদি হতাম?'

'ও রকম হওয়া'—মানে কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই, শেষ জমজমাট অবস্থাটা। এ অবস্থায় আসার কষ্টসাধ্য পথটা নয়।

আর জমজমাট অবস্থাটা দেখে মাথা বিগড়ে গেলে—আমরা হারাবো সদিচ্ছা আর শক্তিকে, পাবো কিছু গ্ল্যামারমুখী ভন্ডামীকে।

অথচ ডেনমার্কের আন্দোলনের খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যা শিখতে পারি, সে সমৃদ্ধি ভেতরটা ভরিয়ে দেয়। আমাদের কাছে খুব দরকারী কিছু খবর, এখানে তাই লিখতে চাইছি।

সংগঠন

সমগ্র ডেনমার্কে নিউক্লিয়ার বিরোধীতায় যে সংগঠনটি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলো, তার নাম—OOA বা Organisationen Til Oplysning Om Atomkraft (উচ্চারণ? অয়্গানিশাচিয়নেন্ ঠিল্ অপলুশ্নিন্ ওম্ আটম্কায়াফ্ট্?)। এরা অবশ্য সংক্ষিপ্ত নাম OOA লিখতে বেশী অভ্যস্ত। সংগঠনের নাম এরা খুব ভেবেচিন্তে রেখেছে The Organisation for Information about Nuclear Power, অর্থাৎ, নিউক্লিয়ার শক্তি সম্বন্ধে তথ্যের জন্য সংগঠন (যদিও ঠিক হতো enlightening বললে, কারণ ডেনিশ ভাষাতে কথাটা information নয়। 'তথ্যের জন্য' বললে নিষ্ক্রিয় সংস্থা হয়ে দাঁড়ায়—oplysning একটি সক্রিয়তার শব্দ)। সংগঠনের নামটা গোড়া থেকেই মোটেই নিউক্লিয়ার বিরোধী নয়—যেহেতু আন্দোলনের মূল ভিত্তিটাও হ'ল শক্তি সম্পর্কে বিতর্ক তোলা, আলাপ চালানো, তথ্য সংগ্রহ আর প্রচার। তাই 'সম্বন্ধে' বা about কথা এরা নামে রেখেছে—কখনোই 'বিরুদ্ধে' বা against কথাটা নয়।

কোপেনহ্যাগেন শহরে, খানিকটা অখ্যাত পাড়ায়, এখন OOA সংগঠনের প্রধান অফিসে গেলে দোতলায় চোখে পড়বে—বেশ কয়েকটা ঘর, অনেকগুলো খুপরি, অসংখ্য কাগজ, ফাইল ইত্যাদি। ঢুকেই দেখা যাবে ছড়ানো আছে কতরকম ব্যাজ, স্টিকার, বই, পুস্তিকা—আপনার কেনার জন্যে। দেখতে পাবেন প্রচুর বইয়ের লাইব্রেরী—রয়েছে নিউক্লিয়ার শক্তির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আড়াই হাজার ইংরেজী, ডেনিশ ও অন্যান্য ভাষায় বই, সযত্নে সাজানো। রয়েছে, অপূর্ব সুন্দর ব্যবস্থায় তালিকাভুক্ত সংবাদপত্রের, অন্য সূত্রের তথ্যের ফাইল—বিভিন্ন দেশ বা বিষয়ে শ্রেণীবিভক্ত। রয়েছে শ্রেণীবিভক্ত করা, অজস্র নিউক্লিয়ার শক্তি সংক্রান্ত প্রবন্ধের কপির ফাইল। আর নানা রকম পত্রপত্রিকা। এ সমস্ত গুলোই কিন্তু স্বপক্ষের আর বিপক্ষের তথ্য, আলোচনা মেশানো। এরা নিজেদেরকে নিউক্লিয়ার বিরোধী তথ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেনি—তুলতে চায় না।

সব থেকে অবাক হতে হয়—কোথাও কোনো আমলাতন্ত্র বা নেতা-সাহেব-বাবু-স্যার নেই। সুশৃংখল এই প্রধান অফিসে সব কিছু খোলা-মেলা, সহজ।

OOA সংগঠনের কোনো সাংগঠনিক সংবিধান নেই! সম্পাদক-সভাপতি-আহ্বায়ক নেই! কোনো কার্যকরী সমিতি নেই! এমন কি কোনো সদস্য নেই!

সাংগঠনিক ব্যবস্থাটা এদের অবিশ্বাস্য গণতান্ত্রিক। একটা ব্যাপার বলে নিই—grass-root এই ইংরেজী শব্দটা (বাংলায় 'গণমুখী'?) ব্যবহারের ধারণা বিশেষ প্রকৃতির হয়। যার মধ্যে সাংগঠনিক ও চিন্তার কাঠামো থাকে সমস্ত মানুষকে নিয়ে কাজ করার। এরা প্রথম থেকেই এই grass-root কাজের সংগঠন গড়ে তুলেছে। যার বর্তমান অবস্থা হলো—

'কাজের দায়িত্বে' নির্দিষ্ট কয়েকজন থাকবে, বিশেষত আর্থিক বা আইনী ব্যাপারে তিনজন স্বাক্ষর ইত্যাদি করার জন্য ঠিক করা হবে—সমস্ত কাজ কর্মীরা চালাবে। কিন্তু কমিটি, সদস্য বা নেতা জাতীয় কিছু থাকবে না। সংগঠনটি চলে নিছক শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে—নেতৃত্বের ভিত্তিতে নয়। কোপেনহ্যাগেনে প্রধান অফিস (নামে national secretariat)। সারা ডেনমার্কে ছড়িয়ে আছে 170 সংখ্যক স্থানীয় গ্রুপ বা যোগাযোগকারী ব্যক্তি। এই স্থানীয় গ্রুপগুলো স্বশাসিত, নিজেদের মতো কাজ করতে পারে, এমনকি নিজেদের নাম যা খুশী দিতে পারে, আবার OOA নামটাও নিতে পারে।

তৈরী হওয়ার প্রথম দু'বছর, বছরে তিন-চারটে করে জাতীর সম্মেলন হতো। এখন বছরে দু'তিনবার করে হয়। প্রায় একশ' থেকে দুশ' কর্মী উপস্থিত থেকে,সমস্ত কাজকর্মের মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত, কর্মসূচী গ্রহণ

প্রচারাভিযান সম্পর্কে OOA-এর অভিজ্ঞতা

6-9 সেপ্টেম্বর 1984 ডেনমার্কে OOA সংগঠনের উদ্যোগে নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনের অবস্থান সম্পর্কে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে OOA-এর গত দশ বছরের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে কী করে শিক্ষামূলক প্রচারাভিযান চালাতে হয়, এ বিষয়ে J. S. Nielsen বক্তব্য রাখে। আটটি পয়েন্টে সমগ্র অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে, নিলশেন্ জানায় 'এটা আমাদের অভিজ্ঞতা—এ কথাটার ওপর আমি জোর দিতে চাই, আর অন্যান্য দেশে আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা আবশ্যিক ভাবে প্রযোজ্য নয়; যেখানে অবস্থা আর কাজের পরিবেশ আলাদা হতে পারে।'

সংক্ষেপে আটটা পয়েন্ট হলো—

(1) জনগণকে ও বিরোধীদের **বোঝানোর** জন্যে আমাদের তাদের **শিক্ষিত** করে তুলতে হবে—অতি সরলীকৃত প্রচার বা **তথ্যবিকৃতি** করে **প্রলুব্ধ** করার পরিবর্তে। এই প্রলুব্ধ করার ব্যাপারটা নিউক্লিয়ার শিল্প-প্রতিষ্ঠান করে থাকে। আমরা দশ বছর সময় নিয়েছি জনগণকে শিক্ষিত করার জন্যে। অতিরঞ্জিত বা অতি-সরলীকৃত প্রচার দিয়ে স্বল্পকালীন ফল পেলেও—দূরভবিষ্যতে আমার জনগণ ও মাধ্যমগুলোর আস্থা হারাবো।

(2) আমাদের নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে — নিউক্লিয়ার প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের সমতুল্য আমাদের নিজস্ব **প্রতি-দক্ষতা** গড়ে তুলতে হবে। আমরা নতুন নতুন বিষয়, বিতর্কে যোগ করবো। বিদগ্ধ বিজ্ঞানীদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে।

(3) সমাজের **সমস্ত গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর**, চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। যারা বুঝে গেছে, তাদের কাছেই শুধু বক্তব্য পৌঁছালে ব্যর্থতা আসে। নিউক্লিয়ার প্রতিষ্ঠানরা আমাদের এই বিচ্ছিন্নতা চায়। আমাদের OOA সংগঠন তাই ডেনমার্কের সমস্ত বাড়ীতে 'গণ প্রচার পত্র' বিলি করেছিলো—সমস্ত গোষ্ঠীর কাছে পেঁছিনোর জন্যে।

(4) **আমাদের বিরোধীদের সম্পর্কে খোলামন** রাখতে হবে। আমাদের কোনো সংস্কারের বশবর্তী হলে চলবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে, কথাবার্তা চালিয়ে কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো সম্ভব। ব্যক্তি মানুষটির সাথে কথা-বার্তা চালানো মানে এই নয়—অর্থনীতিক কাঠামোটাকে কথাবার্তার মাধ্যমে সহজে প্রভাবিত করা যাবে।

(5) **তথ্যের সাথে কাজকর্মকে আমাদের যুক্ত করতে হবে**। কল্পনার সাথে গভীরতা, অনুভূতির সাথে যুক্তিবত্তা। নিছক ক্রিয়াবাদ শুধুমাত্র অদূরদর্শী স্বার্থ সিদ্ধ করবে। আমরা OOA সংগঠনে চেষ্টা করেছি—বিক্ষোভ মিছিলের আগে শিক্ষামূলক প্রচারাভিযান করতে। আবার চেষ্টা করেছি—বিক্ষোভ মিছিল যেন **নতুন** প্রচারাভিযানের প্রারম্ভিক বিন্দু হয়ে ওঠে।

(6) বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের যথাসম্ভব **'মিত্রদের'** জাল গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ যারা ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারে। আমরা তাদেরকে রাষ্ট্র বা ওপরওয়ালার বিশ্বাস ভঙ্গ করতে বলছি না, বলছি—বাস্তবত যাদের **দ্বারা** তারা কর্মে নিযুক্ত, যাদের **জন্য** তারা নিযুক্ত, সেই জনগণের সাথে সংহতি প্রদর্শন করতে।

(7) আন্দোলনের এমন একটা **সাংগঠনিক কাঠামো** দরকার—যেখানে প্রতিটি কর্মী ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক আস্থা অনুভব করে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অনুভব করে, দায়িত্ব ভাগাভাগি করা অনুভব করে। আমাদের চলতি সমাজে একটা ক্ষমতাহীনতা ও নিঃসম্পর্কতার অনুভূতি বেড়ে ওঠে—যায় ফলে নিউক্লিয়ার শক্তি, নিউক্লিয়ার অস্ত্র, দূষণ, বেকারীত্ব ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরো কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের গড়তে হবে—বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, সংহতি, উদ্যোগ আর দায়িত্বের মতো ভালো মূল্যবোধকে।

(8) **আমাদের অতিরিক্ত ধৈর্যশীল হতে হবে**। নিউক্লিয়ার শক্তি বন্ধ করা কয়েক মাস বা বছরের ব্যাপার নয়—কয়েক দশক বা এমন কি কয়েক পুরুষ লাগতে পারে। আংশিক জয়লাভের চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে—চূড়ান্ত জয়ের আগে। লক্ষ্যের দিকে আন্দোলন, আর লক্ষ্য-টিকে আমাদের জানতে হবে—লড়াইয়ের **সময়কালে** আরো ভালো জীবনযাত্রা আমাদের গড়তে হবে, লড়াই শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকা নয়। ও নিজেদেরকে বলতে হবে—এটা সময়সাপেক্ষ লড়াই। পথিমধ্যে আংশিক জয়লাভের রীতি ঠিক করতে হবে আমাদের।

ইত্যাদির কাজটা করে। এই জাতীয় সম্মেলনে কোনো ডেলিগেট ব্যবস্থা নেই, সমস্ত কর্মীরাই আসতে পারে, মতামত দিতে পারে।

সারা ডেনমার্কে ছড়িয়ে আছে বিশেষ কয়েকটা শাখা—অহুশ (Arhus, ডেনমার্কে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর) শহরে রয়েছে শক্তি সম্বন্ধীয় অফিস; অলবোর (Alborg) শহরে শক্তি সম্বন্ধীয় অফিস; আর ওডেন্শ (Odense) ও হেয়ানিন (Herning) শহরে OOA অফিস। সারা ডেনমার্কে ছড়ানো এই সমস্ত কাজগুলো চালায়, স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা। কয়েক জায়গায় রয়েছে কয়েকজনমাত্র paid coordinator, যারা একটা সাদামাটা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। যেমন, প্রধান অফিসে এরকম পাঁচটি পদ আছে, যার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। আর অহুশ শহরে আছে দুটি এরকম পদ, তার সাথে আরো কিছু কর্মী আছে যারা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে—সাধারণত, বাইরের নানা সংগঠনের কাছ থেকে। এদের ব্যাপারটা অবশ্য খুব সম্প্রতিই হচ্ছে—যার ফলে আরো শক্তি সম্বন্ধে কাজ করার অফিস গড়ে তোলা যাচ্ছে। এই বেতনপ্রাপ্ত সমন্বয়-কারীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরা সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীদের কাজকে সমন্বয় করে—আর স্বেচ্ছাসেবীদের অনুপস্থিতিতে এরা কাজ চালিয়ে যায়।

প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা কোপেনহ্যাগেনের প্রধান অফিসে বিভিন্ন সক্রিয় গ্রুপ তাদের কাজ সমন্বয় সাধন করার জন্যে বসে। এটা দৈনন্দিন কাজের মতোই, সাধারণের জন্য অবারিত দ্বার।

OOA মোট প্রায় 10 হাজার সমর্থকের তালিকা তৈরী করেছে—যারা যে কোনো প্রচার অভিযানে মূল গ্রুপ হিসেবে থাকে। এরা OOA-এর প্রচারপত্র, ব্যাজ ইত্যাদি বিলিবন্টনেও সক্রিয়।

পটভূমি ও আন্দোলন

ডেনমার্কের ইশো (Riso) অঞ্চলের নিউক্লিয়ার গবেষণাকেন্দ্র খুব পুরানো। এর সাথে বিদ্যুৎশিল্পের কর্তৃপক্ষ মিলেমিশে প্রায় বিশ বছর ধরে, পরিকল্পনা করছিলো ডেনমার্কে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের। এরা যখন নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র বসাবার পরিকল্পনা প্রকাশ্যে প্রচার করতে আরম্ভ করলো, খুব ছোটো বাম-সমাজবাদী পার্টি ছাড়া, সব রাজনৈতিক পার্টিই ছিলো এটার স্বপক্ষে।

কোপেনহ্যাগেনের জনা তিরিশ ও আশপাশের কয়েকজন খুব দ্রুত এ ব্যাপারটা আপত্তি করতে এগিয়ে এলো। আপত্তি ঠিক নয়, সমালোচনা করতে মূলত। হাতে ছিলো অল্প সময়—1973 জুন থেকে 1974 সালের জানুয়ারীর মধ্যে এদের যা কিছু প্রস্তুতি সংগঠিত হওয়ার জন্য।

1974 সালে জানুয়ারী 30—সরকার থেকে ডেনমার্কে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্য দশটি জায়গার নাম প্রকাশ করা হলো। তার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেদিনের ছোট্ট গোষ্ঠীটি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের ডাক দিলো। এই সফল সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণার মধ্যে দিয়ে, 1974 সালের 31 জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হলে OOA সংগঠন।

অল্পদিনের মধ্যেই—সে বছর মার্চ মাসে OOA করলো প্রথম জাতীয় সম্মেলন। সেই সম্মেলনে সারা ডেনমার্কের জন্যে গৃহীত হলো উদ্দেশ্যে-সম্বন্ধে তিনটি ধারা। এই তিনটি ধারা প্রথম ঘোষিত হয়েছিলো জানুয়ারী 31, 1974 সালে—আর এই তিনটি ধারা আজও OOA সংগঠনের যাবতীয় সাংগঠনিক, মতাদর্শগত, সক্রিয়তার ভিত্তি। এ তিনটি ধারা (বাক্য?) ছাড়া OOA-এর সক্রিয়তার কোনো লিখিত ভিত্তি নেই—

(1.) নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবহারের সাথে জড়িত সমস্ত সমস্যা ও প্রশ্নের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করা (critical evaluation)।

(2) শক্তির বিকল্প উৎস সম্বন্ধে গবেষণা বাড়ানো ও নতুন করে মূল্যায়ন করা।

(3) সামাজিক ও পরিবেশতাত্ত্বিক উভয় উপাদানকে বিবেচনা করবে এ রকম একটা দীর্ঘমেয়াদী শক্তি নীতির উন্নয়ন করা।

একেবারে গোড়া থেকেই অনেকে যদিও অধৈর্য্য হয়ে উঠছিলো—বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ মিছিল, বা প্রতিবাদপত্র সংগঠিত করার জন্যে। কিন্তু কয়েকটা মাত্র সভা করা ছাড়া—OOA প্রথম দু-তিন বছর একেবারে এ ধরনের প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ প্রকাশ করেনি। সতর্কতার সাথে OOA দাবী করেছিলো—বছর তিনেকের জন্যে সরকার নিউক্লিয়ার শক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করুক, কারণ, ডেনমার্কের মানুষ এ ব্যাপারটাতে একেবারে অজ্ঞ। সমস্ত মানুষকে না জানিয়ে এতো বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠেকানোর (moratorium) দাবী ছিলো—OOA-এর প্রথম দাবী। কারণ, OOA ভেবেছিলো কমপক্ষে তিন বছর লাগবে সমস্ত ডেনমার্কে প্রচার চালাতে।

OOA-এর এই দাবীর সাথে একমত, যে কেউ তখন OOA-এর কাজ করতে পারতো। আর তাদেরকে নিয়ে সংগঠনের কাজ বেড়ে চললো।

প্রচারের কাজে OOA ছিলো সাবধানী (নিজেরা এই বিনয়ী থাকাকে বলেছে sober idealism বা নম্র আদর্শবাদ!)—তাই তাদের পত্রিকার নামও ছিলো 'Atomkraft?' ('নিউক্লিয়ার শক্তি?') আর স্লোগান ছিলো—'তুমি নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়ে নিরাপদ বোধ করো?' এটা পরে একটু ধারালো হয়েছে—'নিউক্লিয়ার শক্তি? না, ধন্যবাদ' (Atom-kraft? Nej Tak.)। এই স্লোগানটির সাথে একটি সহাস্য সূর্যের মুখ এঁকে—একটি প্রতীক তৈরী করা হলো। যখনই ডেনমার্কের সরকার 1976 সালের বসন্তে নিউক্লিয়ার শক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে ঘোষণা করলো—সে বছরের গ্রীষ্মকালের দু'মাস, এপ্রিল আর মে মাসে OOA বিপুল বেগে কাজ করতে থাকে।

ওই সহাস্য সূর্যের ব্যাজ ও গাড়ীতে লাগানোর স্টিকার বিক্রী হলো দু'লক্ষ—চিঠিতে লাগানোর জন্য ওই প্রতীক বিক্রী হলো দশ লক্ষ! যে পত্রিকা তিন হাজার কপি বন্টন হতো—সেটা তিনটি আলাদা সংখ্যার সংবাদপত্র হিসেবে বন্টন হলো ন' লক্ষ কপি! ছয় সপ্তাহে—নিউক্লিয়ার শক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থগিত থাক্—এই মর্মে স্বাক্ষর সংগ্রহ হলো এক লক্ষ সত্তর হাজারটা।

1976 সালে 10 আগস্ট—সরকার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো।

OOA কিন্তু এই ঘোষণারও আগে, একটা গুরুতর সফলতা লাভ করে। প্রথম দুবছরে এরা জোর দেয়—নিউক্লিয়ার শক্তি সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্তের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় প্রশাসক হাত থেকে নিয়ে পার্লামেন্টকে দিতে হবে। এই দাবীটি স্বাভাবিকভাবেই পার্লামেন্টের সমস্ত রাজনীতিক পার্টিই বেশ সমর্থন করে—কারণ, এতে তাদের গুরুত্ব বাড়ে। আর বিরাট প্রচার অভিযানের আগে, দু'বছর লাগাতার চেষ্টার ফলে OOA এ ব্যাপারে সফল হয়। এ সময়ে, সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার ঘোষণার আগেই, OOA-এর কাজ বেড়ে যায় অনেক দ্রুত। কারণ সময় কম। ডেনিশ পার্লামেন্ট নিউক্লিয়ার শক্তির বিষয়টা সর্বসমক্ষে মতামতের জন্য (referendum) রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। সরকার সে রকম কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার আগেই—ডেনমার্কের সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে OOA বিতর্কের হাওয়া তুলতে চেষ্টা করেছে।

OOA's Folkpjece (OOA-এর গণ প্রচারপত্র) Denmark uden atomkraft (নিউক্লিয়ার শক্তিবিহীন ডেনমার্ক) ছাপা হলো--1979 সালের নভেম্বরে পাঁচ লক্ষ; 1980 সালের জানুয়ারী আট লক্ষ; 1980 সালে ফেব্রুয়ারীতে দশলক্ষ।

এই প্রচারপত্রটি পৌঁছে দেওয়া হলো ডেনমার্কের প্রত্যেক বাড়ীতে।

প্রথমে কুড়িটা পৌরসভার সাড়ে তিন লক্ষ বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হলো। তারপর, সারা ডেনমার্ক।

প্রত্যেকটি প্রচারপত্রের সাথে আবেদন রইলো—দশ ক্রোনার (প্রায় দশ টাকা) করে সাহায্য করার। কয়েক বছরের এমনই প্রচার অভিযানে—ফল হলো আশ্চর্য।

প্রথম গড়ার সময় 1974 সালের মার্চে OOA জনসাধারণের মধ্যে একটা সমীক্ষা চালায়। আর পরে 1982 সালের সেপ্টেম্বরে আবার সমীক্ষা করে। এর ফলাফল দিয়ে OOA-এর অগ্রগতি বোঝা যায়।

	1974 সাল	1982 সাল
মতামত দেয়নি	31%	17%
নিউক্লিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে	23%	61%
স্বপক্ষে	46%	22%

এমন কি, এই আট বছরের আন্দোলনে, রাজনীতিক পার্টিগুলোর ভেতরেও নিউক্লিয়ার শক্তি সম্পর্কে মতামত পরিবর্তিত হতে থাকে।

1982 সালে দেখা গেলো, বিভিন্ন রাজনীতিক দলগুলোর সমর্থকদের মধ্যে—

নিউক্লিয়ার শক্তির

	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	মতামত নেই
সোস্যাল ডেমোক্র্যাট	14%	73%	13%
কন্‌জার্ভেটিভ	40%	40%	20%
লিবারাল	36%	36%	21%
সোসালিস্ট	11%	86%	3%
প্রগ্রেসিভ পার্টি	39%	49%	12%
অন্যান্য পার্টি	22%	55%	23%

অর্থাৎ সব পার্টিরই অধিকাংশ নিউক্লিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে, এ অবস্থায়, এই সমীক্ষার ফলাফল দিয়ে OOA আবার একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে, 'OOA প্রচারাভিযান,' ছাপায় পাঁচ লক্ষ কপি। ডেনমার্কে ঘরে ঘরে আবার পৌঁছতে থাকে এতো বছরের আন্দোলনের ফলাফল, আর তার সাথে প্রত্যেককে পঁচিশ ক্রোনার (প্রায় পঁচিশ টাকা) সাহায্য করার আবেদন।

প্রচারপত্র, স্লাইড, ব্যাজ, স্টিকার ইত্যাদি নিয়ে অভিযানের সাথে সাথে—বয়স ও শক্তি বাড়ার সাথে সাথে, OOA সারা ডেনমার্কে ধীরে মিছিলও সংগঠিত করতে থাকে। হাওয়া ঘুরছিলো—কিন্তু OOA অক্লান্ত। গত 1984 সালের সেপ্টেম্বরে ডেনমার্কে সংগঠিত করলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন। অপর দেশের অভিজ্ঞতার সাথে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করলো।

নিউক্লিয়ার শক্তি সম্পর্কে পার্লামেন্টর সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থগিত রাখার আন্দোলন ক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আন্দোলন হয়ে দাঁড়ালো।

29 মার্চ 1985 সালে পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নিলো—ডেনমার্কে নিউক্লিয়ার শক্তির সিদ্ধান্ত বাতিল!

তারপর?

নিউক্লিয়ার শক্তি সম্পর্কে আন্দোলন করা OOA সংগঠনের প্রথম উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে। আরো দু'টি উদ্দেশ্যের দিকে অনেক আগেই OOA কাজ শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ, বিকল্প শক্তির উৎস ও পরিকল্পনার ব্যাপারে আন্দোলন। সেটা এখন চলছে।

আর চলছে—কোপেনহ্যাগেন থেকে মাত্র 20 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুইডেনের দুটি নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের বিরুদ্ধে। যার জন্যে ডেনমার্কও বিপদগ্রস্ত।

তা ছাড়াও—OOA চিন্তিত ইশো নিউক্লিয়ার গবেষণা কেন্দ্রটি নিয়েও। এরা এখনও যোগাযোগ রাখে আন্তর্জাতিক নিউক্লিয়ার শক্তিধরদের সাথে। তাই OOA-এর কোথাও বিশ্রাম নেই।

অর্থে স্ব-নির্ভর

এই বিশাল আন্দোলন চালাতে যে টাকা দরকার হয়, তার প্রধান উৎস হলো OOA-এর নিজস্ব পত্রপত্রিকা, ব্যাজ ইত্যাদি বিক্রী। এর ফলে OOA প্রথম তিন বছরে দ্রুত দাঁড়াতে আরম্ভ করে।

1974 সালে (এগারো মাসে) আয় হয় 85 হাজার ক্রোনার, 1975 সালে সেটা হয় 2 লক্ষ ক্রোনার, আর 1976 সালে সেটা দাঁড়ায় 12 লক্ষ ক্রোনারে।

'সহাস্য সূর্যের মুখ' ব্যাজটা এখন মোট 41-টি ভাষায় তৈরী হয়। সমস্ত লোকাল গ্রুপ এটা বিক্রীর একটা ভাগ নিয়ে থাকে।

প্রচারপত্র ডেনমার্কের প্রত্যেক ঘরে পৌঁছে দেওয়ার সাথে 10 ক্রোনার করে পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। পরবর্তী প্রচারপত্র 25 ক্রোনার করে।

এ ছাড়া আছে 'গ্যারান্টী ফান্ড'। বর্তমানে এই ফান্ডে 9 হাজারের ওপর লোক নাম লিখেয়েছে। এরা প্রতি তিন মাসে কিছু টাকা সাহায্য করার গ্যারান্টী দেয় (সেটা 50 বা 100 ক্রোনার হতে পারে, অথবা বেশী বা কম)। এদের সাহায্যে OOA-এর অফিসের কাজ চালানোর খরচ তোলা হয়। সর্বোচ্চ এক হাজার ক্রোনার পর্যন্ত গ্যারান্টী ফান্ডে সাহায্যের জন্য প্রত্যেক ব্যাক্তি আয়কর থেকে ছাড় পায়। OOA সহাস্য সূর্য বিদেশে বিক্রী করলে লাভ রাখে না। স্বদেশের বুকে এদের সমস্ত অর্থ সংগ্রহই প্রধানত জনসাধারণের কাছ থেকে।

[OOA-এর অন্যতম কর্মী সিগ্‌ফ্রিড্‌ ক্রাইস্টেন্‌সেন্‌ ও ডেল্‌ লোভেট্‌, এবং অন্যান্য কর্মীর আলোচনা ও তাদের দেওয়া নথিপত্রের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।]

—সঃ মঃ, বি-ও-বি □

নিউক্লিয় যুদ্ধের ভয়াবহতার ছবি "দি ডে আফটার'

একটি বিশেষ ব্যাগ হাতে একটি লোককে সর্বদাই দেখা যাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পাশে পাশে। ব্যাগে থাকে একটি ক্ষুদে যন্ত্র যার সাংকেতিক নাম—"ফুটবল"। পৃথিবীর মৃত্যু পরোয়ানা জারির 'চাবি' সযত্নে রক্ষিত এই বাক্সে। চাবি টিপলেই মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠবে মুহূর্তে। পরমাণু অস্ত্র সম্বলিত মিসাইল ছুটে যাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন অবস্থায় প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেতে এই ব্যবস্থা। সম্ভবতঃ অপর শিবিরেও আছে অনুরূপ ব্যবস্থা।

কিন্তু সত্যিই যদি এই চাবি টেপা হয় একদিন—তাহলে? সেই ভয়াবহ পরিণতির পটভূমি নিয়ে তৈরী ছবি—"দি ডে আফটার"। ছবিটি প্রথম প্রদর্শিত হয় মার্কিন টিভি নেটওয়ার্কে। প্রায় দু'বছর আগে। ছবিটির প্রথম প্রদর্শনের ঘটনাটি স্মরণীয় হয়ে আছে নানা কারণে। এ নিয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। পরিস্থিতি একসময় এমন হয় যে ছবিটি দেখানোয় সরকারী হস্তক্ষেপের কথাও বিবেচিত হয়।

অবশেষে প্রদর্শিত হয় ছবিটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশ কোটি মানুষ একদিনে একযোগে ছবিটি দেখেছে। প্রায় অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা। এ থেকে প্রমাণ হয় মানুষ কতখানি আতঙ্কগ্রস্ত। এই সুযোগে ওখানকার বহু যুদ্ধ-বিরোধী ও পিপল্‌স সায়েন্স গোষ্ঠী তাদের প্রচার আন্দোলন জোরদার করেন। সরকারী তরফেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেদিনই ছবি শেষ হলে টি-ভি পর্দায় আবির্ভূত হন মার্কিন সেক্রেটারী অব স্টেট জর্জ সুল্‌জ। তিনি জানান—অহেতুক আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছে ছবিটিতে। এমন অবস্থা ঠেকাতেই তো আমরা আছি। ইত্যাদি।

ছবিটি যথারীতি মার্কিন-সোভিয়েত বিরোধ নিয়ে। বিরোধের শুরু পূর্ব জার্মানীর সেনা বিদ্রোহ নিয়ে। দ্রুত সোভিয়েত হস্তক্ষেপে পশ্চিম বার্লিনের সীমান্ত সীল করে দেওয়া হয়। মার্কিন কর্তৃপক্ষ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এরপর সোভিয়েত সৈন্য পশ্চিম জার্মানীর সীমান্ত অতিক্রম করলে মার্কিন সামরিক দপ্তর পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের চরম সিদ্ধান্ত নেয়। শুরু হয় দুপক্ষের ঘাঁটি আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ—।

এই ঘটনার বলি আমেরিকার একটি শহর—কানসাস। এই ছবির পটভূমি। সুন্দর গোছানো শহর মুহূর্তে আগুন, ঝড় আর ধ্বংস-স্তূপে পরিণত। তারপর চারদিকে কেবল নীরবতা। সচল বলতে এদিকে ওদিকে পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আর ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো ভাঙা চোড়া টুকিটাকি জিনিস। জীবিত যারা তাদের চোখ-মুখ ভয়ে আতঙ্কে পাথরের মত কঠিন।

শহরের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রীরা সামরিক বেতার যোগাযোগ গড়ে তোলায় প্রয়াসী। হাসপাতালে কাতারে কাতারে মানুষের ভীড়। আগুনে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণে ঝলসানো ক্ষতবিক্ষত মানুষ। দু'একজন ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। বোধহয় আপনজন কাউকে খুঁজছে। একটি যুবক এসে দাঁড়িয়েছে একটি শয্যার পাশে। শয্যায় শায়িত বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ে। দেখা হতেই দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। হয়তো চিনতে কষ্ট হচ্ছে। তেজষ্ক্রিয় বিকিরণে তাদের মাথা, চোখের পাতা এবং ভুরু চুলগুলি পর্যন্ত ঝরে গেছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে।

—কি যেন বলতে চায় দুজনে। চেষ্টা করে। কথা সরে না। বোধহয় আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা। এরপর চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে তাদের কন্ঠ।

—হ্যাঁ, এমন লক্ষ লক্ষ কন্ঠ স্তব্ধ করে দিতে অপেক্ষা করে আছে গুটি-কয়েক 'ফুটবলের চাবি'। "দি ডে আফটার" আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল সেকথা। দুনিয়ার বাঁচা-মরার চাবি-কাঠি আজ গুটিকয়েক মানুষের হাতে গচ্ছিত। বাদবাকি মানুষ বিচ্ছিন্ন অসহায়। —র. চ. □

"An ancient North American Indian legend predicts that when the Earth has been ravaged and the animals killed, a tribe of people from all races, creeds and colours would put their faith in deeds, not words, to make the land green again. They would be called 'The Warrior of the Rainbow,' projectors of the environment."

নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনের শহীদ

রেইনবো ওয়ারিয়র

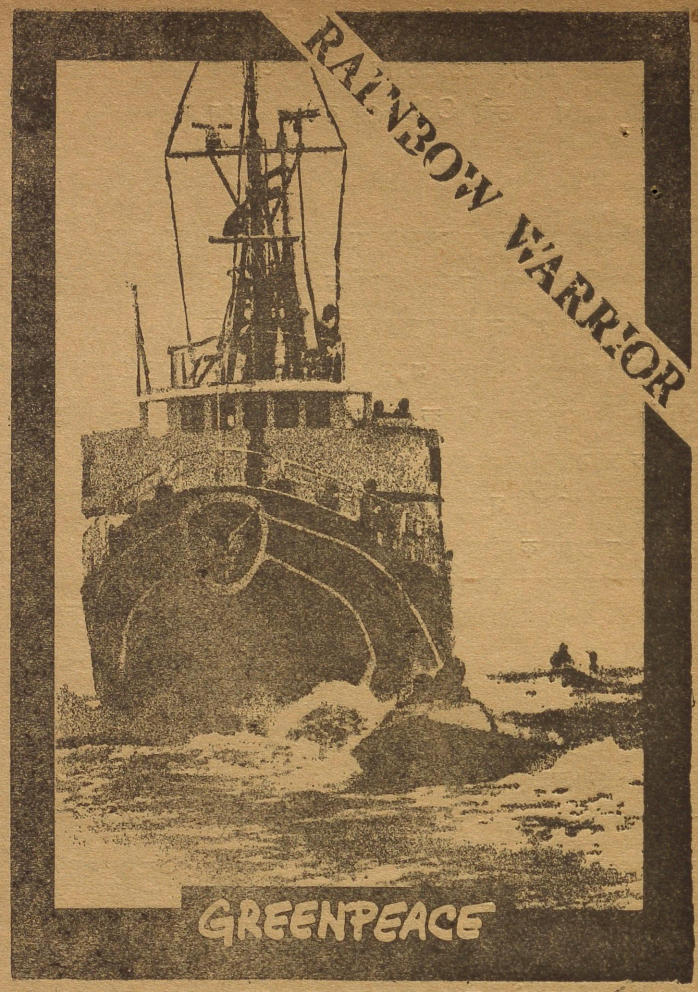

'রেইনবো ওয়ারিয়র' নামটি আর অপরিচিত নয়। গত মাস খানেক খবরের কাগজে বেশ কয়েকবার খবর হয়েছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়—পৃথিবী জুড়ে। একটি ছোট জাহাজের নাম এটি। সম্প্রতি স্যাবোটেজের শিকার হয়েছে জাহাজটি। আসামী পালাতে পারেনি। ধরা পড়ে গেছে। ধরা পড়ে গেছে ষড়যন্ত্রকারীরাও। ফরাসী সরকার এর সাথে যুক্ত। জল অনেকদূর গড়িয়েছে। ফরাসী সরকারের একজন মন্ত্রীকে বিদায় নিতে হয়েছে কেলেংকারীতে যুক্ত থাকায়।

শুনলে অবাক হবেন—একটি পিপল্‌স সায়েন্স গ্রুপের জাহাজ এটি। বিক্ষোভ আন্দোলনের জন্য ব্যবহৃত হয় এই জাহাজ। সংস্থার নাম "গ্রীনপীস"। পরিবেশ দূষণ ও যুদ্ধ বিরোধী সংস্থা।

1977 সালে তারা এই ট্রলারটি কেনেন। সমর্থকরা যুগিয়েছেন অর্থ। এরপর থেকে সম্পূর্ণ নতুন কায়দায় আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে এরা। অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে যেখানে, সরাসরি তার মুখোমুখি হয়ে প্রতিবাদ জানানোই লক্ষ্য। সেটা নিউক্লিয়ার বোমা পরীক্ষার ক্ষেত্রে বা নিউক্লিয়ার বর্জ্য দ্রব্যবাহী জাহাজের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বা নির্মূল-প্রায় সমুদ্র প্রাণী হত্যাকারী চোরাই ট্রলারের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

গ্রীনপীসের এই জাহাজটিকেই গত জুলাইয়ের দশ তারিখে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ডুবিয়ে দিয়েছে ফ্রান্সের গুপ্তচর সংস্থা নিয়োজিত কয় ব্যক্তি। দু'জন দুষ্কৃতকারী ধরা পড়েছে নিউজিল্যান্ড পুলিশের হাতে। খবরটি জানাজানি হতেই তুমুল হৈ চৈ লেগে গেছে দুনিয়া জুড়ে। বিশেষ করে ফ্রান্সের কাগজেপত্রে। গোপন বহু তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে এইসব পত্রিকা। পরিণতিতে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং তাদের গুপ্তচর সংস্থার প্রধানকে স্ব স্ব পদ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ফ্রান্সে বর্তমানে সোসালিস্টরা সরকারী ক্ষমতায় আসীন এবং এই মন্ত্রী ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতরোঁর খুবই কাছের লোক। পৃথিবীর মানুষ চেয়ে আছে এর পরও আর কি হয় দেখতে।

এই ঘটনা আজকের দিনের নতুন ধাঁচের গণ-আন্দোলনের কার্যকারিতা প্রমাণ করল। অনেকেই ভাবছেন ফরাসী সরকার কেন এমন তুচ্ছ ব্যাপারে এত বড় ঝুঁকি নিতে গেলেন? আর বিশেষ করে এমন একটি পিপলস্ সায়েন্স সংস্থা তাদের আক্রমণের পক্ষে বড়ই পুঁচকে যখন!

আসলে পুঁচকে হলেও বড়ই বেয়াড়া জায়গায় হাত দিয়ে দিয়েছে এরা। একবার নয়—এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। দক্ষিণ প্রশান্ত মহা-

সাগরে ছোট্ট দ্বীপ 'মুরুরোয়া আটোল'এ একটি নিউট্রন বোমা পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছিল। গ্রীনপীস বহুদিন যাবৎ ফ্রান্সের এই ধরনের পরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। আশু এই পরীক্ষার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতেই রওনা হয়েছিল 'রেইনবো ওয়ারিয়র'। পথে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড পোর্টে ঘটল এই ঘটনা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নিউজিল্যান্ডের বর্তমান সরকারও এই এলাকায় পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিপক্ষে।

ফরাসী সরকারের জেহাদের কারণ নিশ্চয়ই অনুমান করা যাচ্ছে। বহু বাধা জটিলতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে এ সমস্ত কাজের প্রস্তুতি নিতে হয়। বহু অর্থ ও পরিশ্রমের শেষে মেলে এমন সব 'মহার্ঘ্য বস্তু' (!) —হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা। এখন সেটা একবার বাজিয়ে দেখার মুখে যদি বাগড়া পড়ে তো কার মাথা ঠান্ডা থাকে? বিশেষ করে তার হাতে যদি 'নিউক্লিয়ার ডিভাইস' কিছু থাকে! ফলে যা হবার হয়েছে। নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের ব্যাপারে ফ্রান্সের অদম্য উৎসাহ। 'ডেটারেন্সের' নামে নিউক্লিয়ার অস্ত্র উন্নয়ন প্রকল্প চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

গ্রীনপীসের জন্ম 1971 সালে। একদল মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার উদ্যোগে প্রতিবাদ জানাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন ওই সময়ে। একটি জাহাজ ভাড়া করে রওনা হয়েছিলেন 'টেস্ট-সাইটে'। এলিউশিয়ান আইল্যান্ডের আমচাট্‌কায়। যাত্রাকালে সমুদ্রপথেই সৃষ্টি এই নাম—'গ্রীনপীস'। তারা ঘোষণা করেছিলেন নিউক্লিয়ার যুদ্ধের মহড়ার নামে তেজষ্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পৃথিবীর বাতাস কলুষিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে গ্রীনপীস।

1971 সালের ওই প্রতিবাদ আন্দোলনের পরিণতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেবারের মত ওই পরীক্ষা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল। অনুরূপভাবে 1972-73 সালে অনুরূপ আর একটি পরীক্ষার কার্যক্রম বানচাল হয়েছিল এই মুরুরোয়াতেই। সে পরীক্ষাটিও ছিল ফরাসী সরকারের। দীর্ঘ বারো বছর বাদে একই স্থানে আবার দুপক্ষ মুখোমুখি। এবারের ঘটনা আরো কতদূর গড়ায় দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে আছি আমরা সকলেই।

আটলান্টিকের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল নিউক্লিয়ার বর্জ্য দ্রব্যের ডাস্টবিন হয়ে উঠেছিল। এই অপরাধে সামিল ছিল বেশ ক'টি দেশ। যেমন, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, বৃটেন, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি। 1978 সালে গ্রীনপীসের আন্দোলন এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিণতিতে সাময়িক একটি বিধিনিষেধ তৈরী হয়েছে। 1983 সালে 'নিউক্লিয়ার বর্জ্য' বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশে এই সিদ্ধান্ত হয়। এমন অনেক কার্যকর আন্দোলনের উদ্যোক্তা 'গ্রীনপীস'।

পৃথিবীর ন'টি দেশে ছড়িয়ে আছে গ্রীনপীস সংগঠন। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এরা স্বাধীনভাবে কাজ করেন যে যার দেশে। অর্থ সংগ্রহ করেন সমর্থকদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে এবং বইপত্র প্রচার-সরঞ্জাম বিক্রি করে।

> 'রেইনবো ওয়ারিয়র' জাহাজটিকে সমুদ্রের তলাতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখে দেওয়া হবে। কারণ—"এতো বছর ধরে এতগুলো অভিযানে যে এত ভালো সেবা করেছে আমাদের, সেই জাহাজটির একমাত্র সম্মানজনক শেষকৃত্য হবে সমুদ্রে সুন্দর এক কবর দেওয়ার মধ্যে"—বলেছেন 'গ্রীনপীস' কর্মী ডেভিড ম্যাক্‌ট্যাগার্ট।

সাম্প্রতিক এই বিপর্যয়ে মোটেই দমেননি এরা। এদের চেয়ারম্যান মিঃ ডেভিড ম্যাক ট্যাগার্ট জানিয়েছেন—'ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কথা বিবেচনা করছেন তারা। আর এই অবসরে তারা চুপচাপ থাকতে চান না। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের সংগ্রহের আর একটি জাহাজ রওনা হবে মুররোয়ার উদ্দেশ্যে।

গ্রীনপীসের ঠিকানা—Green Peace, 36 Graham Street, London NI 8LL.

MX মিসাইলের বিরুদ্ধে শোশনদের জেহাদ

একটি স্মরণীয় আন্দোলনের কথা জানাই। পৃথিবীর কম লোকেই জানেন এর কথা। আমরাও জানতাম না, সম্প্রতি জেনেছি। সফল প্রতিরোধ আন্দোলন একটি। বেশীদিন আগের নয়। 1979 সাল। রেগান সরকার সাধের MX—মিসাইল প্রকল্পের জন্য জমি খুঁজছিলেন। মতলবে ছিলেন নেভেদা বা উটার মানুষদের জমিগুলি হাতিয়ে নেবেন।—কিন্তু সাধে বাদ সাধলো সেখানকার মানুষ—পশ্চিমা শোশোনরা (Shoshon)।

কারা এই মানুষ? না, তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার আধুনিকেরা নয়। বরং অহঙ্কারী উন্নত (!) মানুষদের ভাষায় যারা—ইণ্ডিয়ান ট্রাইব। প্রায় বর্বর 'আদিবাসী' মানুষ। ছড়িয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ডে জুড়ে।

যেই শুনল MX—মিসাইলের মত ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী অস্ত্রের ঘাঁটি হতে চলেছে তাদের জমি, অমনি রুখে দাঁড়াল স্বভাবজাত অনমনীয় দৃঢ়তায়। সঙ্ঘবদ্ধ হল সহমর্মী গোষ্ঠীর মানুষদের সাথে। গড়ে উঠল ওয়েস্ট শোশোন সেকরেড ল্যান্ডস্ এসোসিয়েশন। তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল অন্য অনেক সংগঠন, খৃষ্টান পাদরী ও বহু ব্যক্তি।

শোশনদের এই আন্দোলন 'পরিবেশ সংরক্ষণ'এর আন্দোলন। এই পৃথিবী ও তার পরিবেশের প্রতি এদের শ্রদ্ধা এবং মমত্ববোধ জন্মগত। পৃথিবীকে এরা ভালবাসে। যুগ যুগ ধরে মেনে আসছে এভাবেই। সেই পৃথিবীর পরিবেশ যে বা যারা ধ্বংস করতে চায়, তারা মানবজাতির শত্রু—একথা বিশ্বাস করে এরা। তাদের আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি নিহিত এই মানসিকতার মধ্যেই।

শোশনদের এই আন্দোলনে পুরাতন ও নতুন ভাবধারার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা গেল। একদিকে প্রকৃতি-প্রেমের মত 'প্রাচীন' মানসিকতা অন্যদিকে আধুনিক সাংগঠনিক বোধের চমৎকার নজির। এই আন্দোলন প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায় উদাসীন আধুনিক মানুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, আর পরিবেশ আন্দোলনের সাথীদের কাছে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মত দৃষ্টান্ত।

র. চ. □

সম্প্রতি ভূপালে

ভূপাল গ্যাস ঘটনার অব্যবহিত পরেই বহু সংবাদ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হলেও, কিছু কাল পরেই যেন সমস্ত আলোচনা থিতিয়ে পড়ে। কালে ভদ্রে কিছু সংবাদপত্রের প্রত্যন্ত কোণে ভূপাল সম্বন্ধীয় কিছু সংবাদ থাকলেও, সেখানে যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-গুলি কাজ করছেন, তাদের কাজের ধারা বা গুরুত্ব সম্পর্কে কোন তথ্যই প্রকাশিত হয় না।

গ্যাস দুর্ঘটনার নয় মাস পর ভূপালে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি কী ধরণের কাজ করছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা এখন মূলত দুটি কাজ চালাচ্ছেন ; প্রথমতঃ সোডি-থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন দিয়ে চিকিৎসা চালান, এবং দ্বিতীয়ত একটি গায়নিকোলজিকাল সার্ভেতে সাহায্য করা। সোডি-থায়ো-সালফেট নিয়ে সরকারী টালবাহানা ও এ নিয়ে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের হয়রানির খবর পূর্বে প্রকাশিত। এখন থায়োসালফেট দ্রবণ ও সিরিঞ্জ সরবরাহের ভার সরকার গ্রহণ করেছে, জনস্বাস্থ্য ক্লিনিক চালু করা হয়েছে গত 9 ই সেপ্টেম্বর থেকে। কেন্দ্রের কর্মীরা অক্লান্তভাবে রোগীদের ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছেন।

গ্যাস-দুর্ঘটনার সময়ে যাঁরা গর্ভবতী ছিলেন, এবং পরে যাঁরা গর্ভবতী হয়েছেন সেইসব মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি সার্ভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সার্ভেতে সহযোগী সংগঠনগুলি হল ঃ

1. জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভূপাল 2. কিশোর ভারতী, মধ্যপ্রদেশ 3. মহিলা মুক্তিমোর্চা, বারানসী 4. সবলা সংঘ, দিল্লী 5. অ্যাকশন-ইণ্ডিয়া, দিল্লী 6. অঙ্কুর, দিল্লী 7. সহেলী, নতুন দিল্লী 8. জাগোরী নতুন দিল্লী 9. প্রয়াস, রাজস্থান 10. সেণ্ট জন মেডিকেল কলেজ, ব্যাঙ্গালোর 11. নারী অত্যাচার বিরোধী মঞ্চ, বোম্বাই 12. সাহিয়ার, বাদাদোরা। **সার্ভের সংযোজক—মেডিকো ফ্রেণ্ড সার্কল্**। এই গায়নি-কোলজিকাল সার্ভে শুরুর প্রাক্কালে হিন্দী ভাষায় ছাপা একটি প্রচার পুস্তিকা বিলি করা হয় এবং একই সঙ্গে স্থানীয় লোকজনদের এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়। ভূপালের অধিবাসীরা সাগ্রহে এ ধরণের কাজে সহযোগিতা করেন। এই সার্ভে শুরু হয় কৈঁচি-ছোলা এলাকায় 23 শে সেপ্টেম্বর, শেষ হয় 25 তারিখে। জয়প্রকাশ নগরে 26-27 এবং কাজী ক্যাম্প এলাকায় 28 ও 29 তারিখে এই সার্ভে চালান হয়।

ভূপালের সরকারী হাসপাতালগুলির চিকিৎসার মান সন্তোষজনক নয় এবং স্পষ্টতই দায়সারা গোছের। ফলে আজও গ্যাস পীড়িত মানুষদের আশ্রয়স্থল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিই। এদিকে সংগঠন-গুলির জনবল ও অর্থবল বলা বাহুল্য, নিতান্তই যৎসামান্য। থায়ো-সালফেট ছাড়া অন্য ওষুধপত্রের সংস্থান নেই, রক্ত-প্রস্রাবাদির পরীক্ষার যন্ত্রপাতির কথা তো স্বপ্নকল্প! সুতরাং কর্মীদের "একটি-লক্ষণের জন্য একটি-ওষুধ" এই প্রথায়, চিকিৎসা চালাতে হচ্ছে। অন্ত্র-ফুসফুস যকৃতের ও রক্তের ক্ষতির পরিমাণ অজ্ঞাত রয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে সকলেই চিকিৎসক ; দলে রসায়নবিদ, প্রাণীবিদ বা উদ্ভিদবিদ না থাকায় জল, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্যে বিষের পরিমাণ ও অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। চিকিৎসা ও সার্ভের ফলাফলগুলিও জনসাধারনের কাছে পৌঁছচ্ছে না। জনসাধারণের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সংযোগও ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে। সর্বোপরি, ভূপালের পরে সংঘটিত বহু গ্যাস-দুর্ঘটনাস্থলে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সংবাদপত্রগুলিও এ নিয়ে কোন কথা প্রকাশ করছে না। সরকারী নিষ্ক্রিয়তা তো সর্বস্বীকৃত। □

—দেবল দেব

চিকিৎসা ঃ দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক আর নয়

এতাবৎ রোগ হলে চিকিৎসকের নৈপুণ্যে আমরা কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়েছি, রোগীর মৃত্যু হলে কপালের লিখন বলে শোকতপ্ত মনে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে দেরীতে হলেও আমাদের দেশেও কেউ কেউ এখন সহৃদয় ও বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার দাবী করছেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে দায়ভোগী করছেন বা করার কথা ভাবছেন।

চব্বিশ বছরের মেয়ে শুভ্রা সেনগুপ্তা জণ্ডিস্ (ইনফেক্টিভ হেপাটাইটিস) নিয়ে ভর্তি হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে গত ডিসেম্বরের গোড়ায়। আঠার দিন পরে সেখানে তার মৃত্যু, হয়। তার মামা শ্রী সুদর্শন সেনগুপ্ত অভিযোগ তুলেছেন, তাঁর ভাগ্নীর মৃত্যু রোগের পরিণতিতে ঘটে নি। তাকে এমন একটি ওষুধ (নালিডিক্সিক অ্যাসিড Nalidixic Acid) দেওয়া হয়েছিল, যা লিভারের ক্ষতি করে। ফলে রোগে ক্ষতিগ্রস্ত লিভার ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় আরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্যই শুভ্রার মৃত্যু ঘটেছে। অর্থাৎ ডাক্তারের ভুল চিকিৎসাই তার মৃত্যুর কারণ। সুদর্শনবাবু আলিপুরের মহকুমা হাকিমের কাছে তাঁর অভিযোগ দায়ের করেছেন, এবং ইতিমধ্যেই মামলাটির কয়েকটি শুনানী হয়েছে। গত শুনানীটি ছিল 13 ই সেপ্টেম্বর। এদিন আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের ভেষজ বিদ্যার অধ্যাপক ডঃ পীযূষকান্তি সরকার তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে রোগিনী যখন লিভারের প্রদাহে ভুগছিলেন সেক্ষেত্রে তার মূত্রনালীতে কোনো সংক্রমণ ঘটে থাকলে সেজন্য অন্য ওষুধ দেওয়া চলতে পারত। নালিডিক্সিক অ্যাসিড লিভারের পক্ষে নিঃসন্দেহে ক্ষতিকারক। পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য হয়েছে 4 ডিসেম্বর। ঐ দিন ইউনিভারসিটি কলেজ অব মেডিসিনের অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। □

—বিশেষ সংবাদদাতা

দুইটি সন্তানের জন্ম সময়ের মধ্যে
তিন বছরের ব্যবধান রাখুন

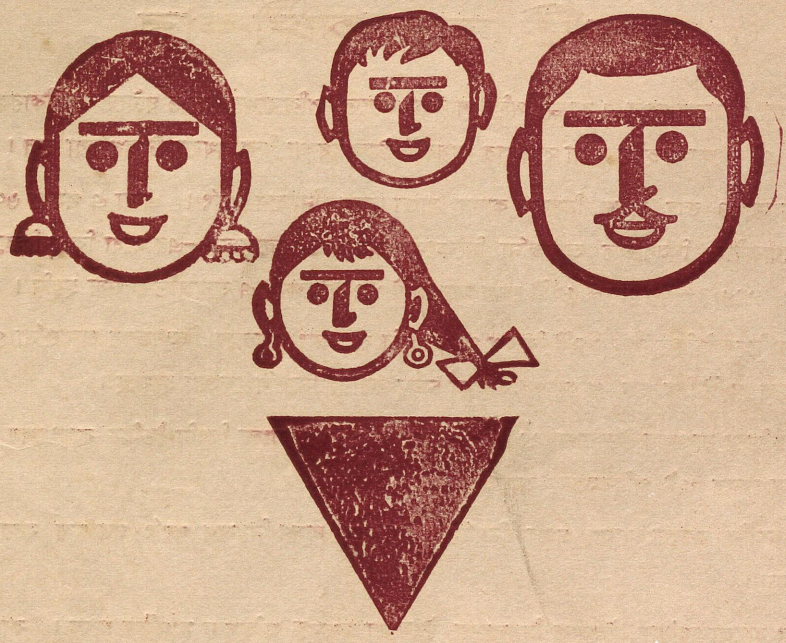

নিরোধ কপার টি খাবার বড়ি

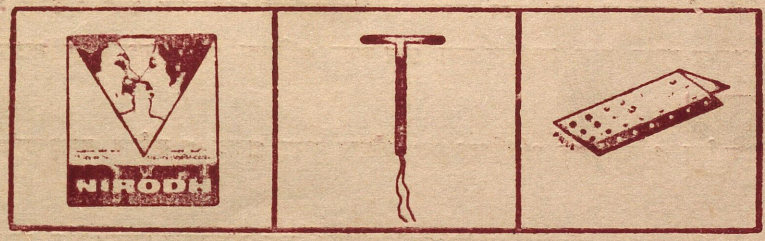

যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিন

davp 84/225

R.N.34929/79

YEAR 9 NUMBER 2

VIGYAN O-VIGYANKARMI
c/o D. S. Enterprise.
52/9C. B.B. Ganguli Street, Cal-1
Sept.-Oct. 1985

পশ্চিমবঙ্গে উন্নততর পরিবেশ
একটি দৃঢ় অঙ্গীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তর এ রাজ্যে পরিবেশ রক্ষা করতে, পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে অঙ্গীকারবদ্ধ। গত দু বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়ে এই লক্ষ্যে গৃহীত নানা ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক এখানে উল্লেখ করা হল।

শিল্পের কারণে বায়ু ও জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ করেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ। এঁরা এ পর্যন্ত ৬৭৮টি সংস্থাকে নদী, কূপ বা ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীতে শিল্পজাত আবর্জনা নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছেন—এর মধ্যে কিছু কিছু সংস্থাকে নতুন করে অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪—৮৫ সালে ৫২টি ক্ষেত্র সহ মোট ১৪৬টি ক্ষেত্রে এ অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বৃহদাকার দূষণকারীদের চিহ্নিত করে ২৪টি শিল্পে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে শিল্পজাত আবর্জনা প্রক্রিয়ণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৮৪—৮৫ সালে ৫২টি শিল্পকে প্রক্রিয়ণের ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কারখানার ধোঁয়া ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৮৪-৮৫ সালে ১১০টি সংস্থা চিমনি তৈরির কাজ শেষ করেছে। আলোচ্য সময়ে আরও ৩৪০টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে।

হুগলী ও চূর্ণী নদীর জলের দূষণ মাত্রা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ গত চার বছর ধরে এই দুই নদী নিয়মিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

জোরালো হর্ণ এবং কালো ধোঁয়ার উৎপাত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান সংগঠিত হচ্ছে। কালো ধোঁয়া ছাড়া এবং নিষিদ্ধ হর্ণ বাজানোর কারণে এ পর্যন্ত ১৭৬টি গাড়ির সার্টিফিকেট এবং ফিটনেস সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

পরিবেশগত শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নেওয়ার জন্য অনেকগুলি স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠনকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং বন দপ্তরের সহযোগিতায় বৃক্ষ রোপণের কাজে হাত দেওয়ার জন্য গ্রাম সভা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

পূর্ব কলকাতায় ট্যানারির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া এবং দীঘায় বায়ু প্রবাহ ও বালির দ্বারা ভূমিক্ষয়ের ওপর সমীক্ষা চালানো হচ্ছে।

কলকাতার নয়টি স্থানে সাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার নির্মাণের জন্য কলিকাতা মহানগরীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে টাকা দেওয়া হয়েছে।

আলিপুর চিড়িয়াখানার জন্য একটি আধুনিক পশুচিকিৎসালয় তৈরির কাজ সমাপ্তির পথে। দার্জিলিঙের পদ্মজা নাইডু চিড়িয়াখানা এবং লয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

দূষণ হ্রাস এবং পরিবেশ সংরক্ষণের চাবিকাঠি হল জনসাধারণের সচেতনতা। আমরা পরিচ্ছন্নতর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকার ঐকান্তিকভাবে পুনর্ঘোষণা করছি এবং এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য জনগণের সমর্থন কামনা করছি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অ ই সি এ ৪৯২১ / ৮৫

রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15/সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-9 হইতে মুদ্রিত